বিষ পিঁপড়ে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী/কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী—১৯৫৯

প্রকাশক ঃ
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮-এ টেমার লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ
সুব্রত চৌধুরী

মুদ্রণে ঃ
প্রিন্টেক্স
কলিকাতা-৭০০০০৪

ঠিক রবীন্দ্রসদনের মুখেই স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল গাড়িটার। ততক্ষণে ট্রাফিক পুলিশের সিগন্যাল পেতে দু'পাশ দিয়ে বাকি সব গাড়ি হুস হুস করে বিদ্যুৎবেগে পার হয়ে গেল ক্রশিঙ। শুধু রূপমের ঝকঝকে অ্যাম্বাসাডারটাই বারকয়েক গির-র-র-গির-র-র শব্দ বার করল ইঞ্জিন থেকে, কিন্তু ওই পর্যন্তই, এক পাও এগোল না আর। এটা তাদের অফিসের গাড়ি নয়। ভাড়া করা গাড়ি। ড্রাইভার দু-চারবার সেলফে চাবি ঘুরিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর অস্বস্তির গলায় বলল, 'স্যার, কারবুরেটরে তেল আসছে না মনে হয়,' বলেই দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে গেল বনেট খুলতে। তাদের গাড়ির পেছনে তখন আরও হাজারটা গাড়ি পিঁক পিঁক পিঁক পিঁক শব্দে মাথা খারাপ করে দিতে শুরু করেছে। দু'পাশের সব গাড়ি বেরিয়ে গেছে, কিন্তু পেছনের গাড়িগুলো কোনটাই যেতে পারছে না। গাড়িগুলো সিগন্যালের মুখে এত গায়ে গায়ে দাঁড়িয়েছিল যে একজন না এগোলে আর কেউ যেতে পারবে না। ফলে পিঁক পিঁক শব্দের সঙ্গে অসংখ্য কটূক্তি, গালাগালও ভেসে আসতে লাগল রূপম ও তার ড্রাইভারের উদ্দেশে। সামনে, একটু দূরে দাঁড়ানো ট্রাফিক পুলিশও অধৈর্য হয়ে কটু মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে। এই অফিস টাইমে ক্রশিঙের মুখে কোনও গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার অর্থ এক্ষুণি রবীন্দ্রসদনের মতো ব্যস্ত মোড়ে ট্রাফিক জ্যাম। রূপম টেন্‌স হয়ে বলল 'কী হল, পঞ্চু?'

ড্রাইভার পঞ্চু তখন বনেট বন্ধ করে বিপন্ন গলায় বলল, স্যার, নামতে হবে, গাড়িটা ঠেলে ওপারে নিয়ে যাই। কারবুরেটরে ময়লা জমে গেছে।

ঠেলতে হবে! রূপমের চোখে মুখে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম। অ্যাটাচিটা সিটের উপর শুইয়ে রেখে দ্রুত নেমে এল গেট খুলে।

চতুর্দিক থেকে তখন মুষলধারে বর্ষিত হচ্ছে অজস্র গালাগাল, রুষ্ঠ কন্ঠস্বর।

পণ্ডু কিছুক্ষণ ঠেলতে চেষ্টা করল একাই। কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ রূপমকে বলল, স্যার, একটু হাত লাগাবেন?

রূপমের তখন রাগে গা জ্বলছে। এমনিতেই দেরি হয়ে যাচ্ছে তার অফিসের. তার উপর ক্রুশিণ্ডের মুখে অজস্র কটূক্তির শরিক হয়ে অপমানে লজ্জায় চোখ মুখ গরম হয়ে উঠেছে তার। এখন আবার হাজারো দৃষ্টির সামনে তাকে গাড়ি ঠেলতে হবে শুনে চোখ গনগনে করে বলল, 'খারাপ গাড়ি নিয়ে বেরোও কেন রাস্তায়।'

ঠেলতে ঠেলতেই পণ্ডু গলার স্বরটা নরম করার চেষ্টা করল, গাড়ির কণ্ডিশন ঠিক আছে, স্যার। কারবুরেটরে ময়লা জমেছে তেলের জন্যে। এত খারাপ তেল দিচ্ছে পাম্প থেকে।

রূপম বাধ্য হয়ে হাত লাগাল। কোনও ক্রমে চোখ কান বুজে তার চকলেটরঙের সাফারি বাঁচিয়ে ঠেলে পার করে আনল ক্রুশিণ্ডটা। রবীন্দ্রসদন পার হয়ে নন্দনের সামনে গাড়িটা রাখল পণ্ডু। তারপর ফের বনেট খুলল।

হাতঘড়িতে চোখ রেখে ছটফট করে উঠল রূপম। সে যাবে ক্যামাক স্ট্রিটে তার অফিসে। দশটা বাজার আগেই তার অফিসে ঢুকে পড়ার কথা। অথচ এখনই দশটা বাজে। পণ্ডুকে তাড়া দিতেই সে অপ্রস্তুতের মতো হাসল, 'এক্ষুণি হয়ে যাবে, স্যার।'

পণ্ডু তো ক্যাবলার মতো হেসেই খালাস। সে তো জানে না, সকালের এই সময়টুকু কতখানি মেপেজুকে চলতে হয় রূপমকে। তাদের কোম্পানির অফিস আওয়ার্স শুরু হয় রাইট অ্যাট টেন ও'ক্লক। দশটা দশ হলেই লেট-মার্ক পড়ে যাবে লালকালিতে। আর সেই লাল দাগটি দেওয়ার দায়িত্ব কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার রূপম রায়ের। অতএব যে করেই হোক, রূপমকে নিজের চেম্বারে ঢুকে পড়তে হয় দশটা বাজার আগেই। সে ভাবেই হিসেব করে বাড়িতে তৈরি হতে শুরু করে সে। চেতলায় গোবিন্দ আঢ্য রোডে তার ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে ক্যামাক স্ট্রিট অফিসে পেঁছতে খুব বেশি হলে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট। ন'টার আগেই তার বাড়িতে অফিসের

গাড়ি রিপোর্ট করে। তার ড্রাইভার সেণ্টু ভীষণ পাঙ্চুয়াল। ন'টা কুড়ি বাইশে রওনা দিলে দশটার আগেই অফিসে ঢুকে পড়তে পারে বেশ নিশ্চিন্তেই। সেভাবেই চলে আসছে আজ তিন বছর।

রূপম আবার ব্যস্ত হয়ে তাড়া দিল, কি হল, পঞ্চু?

পঞ্চু ততক্ষণে দ্রুত ও দক্ষ হাতে কারবুরেটরের বাটি খুলে এনে তার থেকে ময়লা পরিষ্কার করছে। বাটিটা এনে একবার দেখালও রূপমকে। 'স্যার, এই দেখুন তেলের ভেতর কত ময়লা।

রূপমের তখন দেখার সময় নেই। তার নজর তখন ঘুরছে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে। এখন প্রতিটি মুহূর্তই তার কাছে খুবই জরুরী।

পঞ্চু তার কারবুরেটরের কাজ শেষ করে যখন বনেট বন্ধ করল, ততক্ষণে দশটা বেজে কুড়ি মিনিট। দশটা কুড়ি! মাই গড্। রূপমের হার্টবিট বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। এতখানি লেট তার জীবনে বোধহয় কখনও হয়নি। পঞ্চু স্টিয়ারিং ধরতেই সে প্রায় হুঙ্কার দিয়ে উঠল, এখন অফিসে গিয়ে আর কী হবে!

ক্যামাক স্ট্রিটে বিশাল মালটিস্টোরিড বিল্ডিংটির সেভেনথ্ ফ্লোরে তাদের 'দি ওয়ার্লর্ডওয়াইড সিল্ক ট্রেডিং কোম্পানি'র ঝকঝকে অফিস। সারা পৃথিবী জুড়ে সিল্ক এক্সপোর্ট করাই তাদের ব্যবসা। সেই অফিসের লিফ্টের কাছে যখন পেঁছিল, তার ঘড়িতে দশটা বেজে ছাব্বিশ। অথচ লিফ্টের সামনে লম্বা লাইন। দশটার আগে পেঁছিলে তখন লাইনই থাকে না প্রায়। এখন এত বড় লাইন দেখে ড্রাইভারটাকেই মনে মনে গালাগাল দিতে শুরু করল। কোম্পানির যে অ্যাম্বাসাডারটি সে রোজ ব্যবহার করে, তার ক্লাচে ব্রেকে কী গণ্ডগোল দেখা দেওয়ায় দিন সাতেকের জন্য রিপেয়ারিং গ্যারেজে দিতে হয়েছে সেটাকে। সেই সাতদিন 'সি গাল রেণ্ট আ কার' নামের একটা কোম্পানি থেকে ভাড়া-গাড়ি আসছে তার জন্যে। সেই গাড়িই আজ ডুবিয়েছে তাকে।

লিফ্টের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রূপম একবার ভাবল, সে দুদ্দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাবে কি না অফিসে। পর-

মুহূর্তেই মনে পড়ল, সম্প্রতি সাঁইত্রিশ পার হয়েছে সে। ক'দিন আগেই ডাক্তার বলেছেন, প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করা মানেই অহরহ টেনশনে ভোগা। ব্লাড প্রেসার হাই হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অতএব এখন থেকে সাবধান হোন। কোলেস্টরল হয় এমন খাবার-দাবার যতদূর সম্ভব পরিত্যাজ্য। সিঁড়িটিঁড়ি খুব দরকার না হলে ভাঙবেন না। এমন সাবধানবাণী শোনার পর সেভেনথ্ ফ্লোরে হেঁটে ওঠার অ্যাডভেঞ্চার না করাই ভাল। অতএব লাইনেই—

লিফ্ট থেকে বেরিয়ে দু'পাশের সেকশেনগুলো পার হওয়ার সময় যথাসম্ভব নিজেকে লুকোতে চাইল রূপম। সবচেয়ে মুশকিল হল ইউনিয়নের লিডারদের নিয়ে। সে যে আধঘন্টা পরে এসে চেম্বারে ঢুকেছে, এ কথাটা তারাই হেসে হেসে জানিয়ে দেবে তাদের কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিরণ সান্যালের কানে, বলবে, 'স্যার, অ্যাটেনডেন্স নিয়ে এত কড়াকড়ি করলে কী হবে, জি এম সাহেব নিজেই তো আজকাল লেটে আসছেন।'

আজ শব্দটা কি নিপুণভাবে 'আজকাল' হয়ে ঢুকে যাবে এম ডি-এর কানে। শুনে তাদের এম ডি ঠোঁট বাঁকিয়ে মুচকি হাসবেন একঝলক। খুব উপভোগ করবেন খবরটা। রূপম যেমন লালদাগ মারার পর কেউ অফিসে এলে তাকে বলে, 'ট্রেন তো রোজই লেট হচ্ছে, সুকেশবাবু, তাহলে আগের ট্রেনে আসার চেষ্টা করুন। তেমনি এম ডি-ও হয়তো হাসতে হাসতে তাকে বলবেন, 'গাড়ি তো খারাপ হতেই পারে। রাস্তার জ্যাম, গাড়ি খারাপ সবই হিসেবের মধ্যে রাখতে হয়, তুমি আরও একটু আগে বেরুবার চেষ্টা করো। নইলে ইউনিয়নের লিডাররা যা তা বলে যায় অফিসারদের নামে। সেটা শুনতে কি ভাল লাগে।'

আসলে এম ডি'র সঙ্গে তার একটা অলিখিত কোল্ডওয়ার বেশ কিছুদিন যাবৎ চলে আসছে। সে কারণেই এম ডি এই খুঁতটুকু উপভোগ করবেন বেশ তারিয়ে তারিয়ে। সেটাই রূপমের টেনশনের অন্যতম কারণ। তাছাড়া ইউনিয়নের লিডার, অফিসের স্টাফ সবাই নানান কথা বলবে আড়ালে।

সুইং ডোরটা ঝট করে টেনে দ্রুত সে গিয়ে বসল তার রিভলভিং

চেয়ারটিতে। অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টারটিই সে টেনে নিতে যাচ্ছিল অভ্যাসমতো, তার আগেই চোখে পড়ল, তার উড-কালারের সান-মাইকা-লাগানো হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর একটা লম্বা সাইজের চমৎকার খামের দিকে। হালকা নীল রঙের যে কারি-কুরি রয়েছে খামটার ওপর, তাতে সমুদ্রের আদলই ফুটে উঠেছে যেন বা।

রিভলভিং চেয়ারে নিজেকে ন্যস্ত করতে করতে ঈষৎ ভুরু কুঁচকে রূপম হাতে তুলে নিল খামটা। নিশ্চয় কোনও ডিনার পার্টির নিমন্ত্রণ। অফিসের কোনও ক্লায়েন্ট রেখে গেছে সৌজন্য-বশত। এ ধরনের কোনও পার্টি সে অ্যাটেণ্ড করে না জেনেও অফিসের সঙ্গে জড়িত ব্যবসাদাররা প্রায়শ তাকে কার্ড পাঠায়। বেশিরভাগই ককটেল পার্টি। এটাতেও সে যাবে না তবু কোন ক্লায়েণ্ট নিমন্ত্রণপত্র পাঠালো তা জানতে কৌতুহলী হয়ে খামটা খুলতে গিয়ে দেখল, মেলিং অ্যাড্রেস তার নামে নয়, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নামে। খামের মুখটা খোলা, তার ভেতরে উঁকি মারছে খামের চেয়েও বর্ণাঢ্য একটি কার্ড। কার্ডের সঙ্গে জেমস ক্লীপ দিয়ে আটকানো এক টুকরো নোট, নোটটা তাদের এম ডি-র।

রূপমের ভুরুতে ভাঁজ আরও গভীরতর হল। কার্ডে চোখ বুলোতেই দেখল, ইনভিটেশনটা পাঠিয়েছে বোম্বে থেকে কিষেণলাল রেয়নমিলের চেয়ারম্যান। তাদের মিলের পক্ষ থেকে এপ্রিল মাসের চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ তারিখে একটা সেমিনারের আয়োজন করেছে। তাতে তাদের মিলের সুতো কেনা বেচার সঙ্গে জড়িত ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান সংস্থার কর্ণধারদের অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ। চীন কোরিয়া থেকেও কয়েকজন সিল্ক এক্সপার্ট নাকি আসছেন সেমিনারে যোগ দিতে। সেমিনারটি অবশ্য বোম্বে নয়, হচ্ছে গোয়াতে। কর্ণধাররা ইচ্ছে করলে সপরিবারেও আসতে পারেন গোয়ায়। সেক্ষেত্রে আগে থেকে চিঠি লিখে জানালে তাঁদের জন্য আলাদা স্যুটের বন্দোবস্ত করবে মিল কর্তৃপক্ষ।

কার্ডের বিষয়বস্তু ভাল করে অনুধাবন করার পর রূপম চোখ বোলাল এম ডি'র নোটটির দিকে, তাতে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা,

আই উইল রিমেইন আদারওয়াইজ বিজি ইন দি লাস্ট উইক অফ এপ্রিল। জি এম উইল প্লিজ অ্যাটেন্ড।

কার্ডের আমন্ত্রণ, তার সঙ্গে এম ডি'র নোটটি পড়ে হঠাৎ সব কিছু যেন গুলিয়ে গেল রূপমের। এ ধরনের ইনভিটেশন তাদের সিল্ক ট্রেডিং কোম্পানির কাছে মোটেই অভিনব নয়। বছরে তিন চারবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এরকম সেমিনার মিটিং ওয়ার্কশপের কার্ড এসে থাকে। এ সব অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত একটা গেট টুগেদার কিংবা হলিডে ট্রিপে পর্যবসিত হয়। আসল কথা হল, ক্লায়েন্টদের একটু তোয়াজ করা। দামি হোটেলে তিন-চারদিন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা, কাছাকাছি টুরিস্ট স্পটগুলো একটু ঘুরিয়ে দেখানো এসবের ওপরই জোর দেন সংগঠক প্রতিষ্ঠান। যাতে পরবর্তীকালে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে ব্যবসা করতে তেমন অসুবিধে না হয়।

সাধারণত চেয়ারম্যান কিংবা ম্যানেজিং ডিরেক্টররাই এসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে থাকেন। কখনও তাঁরা ব্যস্ত থাকলে তাঁদের নীচের ধাপের অফিসাররা। সেও কালেভদ্রে। রূপম এই কোম্পানিতে আসার পর গত তিনবছরে এহেন 'ট্যুর' তার বরাতে কখনও জোটেনি। জুটবেই বা কী করে। এসব কার্ড এলে এম ডি বরাবর নিজেই লাফ দিয়ে ছোটেন সেমিনার কিংবা মিটিং-এ যোগ দিতে। এই তো, মাসতিনেক আগেই এম ডি সপরিবারে গিয়েছিলেন কন্যাকুমারিকায়।

তারপরই এই গোয়ার কার্ডটি আসতে হঠাৎ সেটি নিজের ড্রয়ারে না রেখে কেনই বা জি এমের চেম্বারে পাঠিয়ে দিলেন, রূপম তাই-ই ভাবতে বসল একরাশ বিস্ময়ের ভেতর ওতঃপ্রোত হয়ে

সে এই কোম্পানিতে জয়েন করার আগে যিনি এখানকার জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন তাঁকে একবার জাপান পাঠানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল জাপানে সিল্কের বাজার তৈরি করা। সেবার কোম্পানি থেকেই পাঠানো হয়েছিল প্রায় লাখ তিনেক টাকা খরচ করে। পনেরদিন জাপানে প্রমোদভ্রমণ করে তিনি মাত্র

বারো হাজার টাকার অর্ডার আনতে পেরেছিলেন। তাতে কোম্পানিতে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো দু'মাসের মধ্যে এ কোম্পানি ছেড়ে অন্য কোম্পানিতে বেশি স্যালারি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন সেই জি এম।

রূপম তাঁর সাকসেসর হিসেবে এসে আর বিদেশ যাওয়ার কথা ভাবেই নি। অথচ এক্সপোর্ট বাড়াতে গেলে বিদেশে যাওয়া, সেখানকার মার্কেটে ঘোরাঘুরি করা অবশ্যই দরকার। এই মুহূর্তে সেই সম্ভাবনা নেই বলে রূপম এখন বিদেশ থেকে আসা যাবতীয় কোয়ারিজের উত্তর দেয়। স্যাম্পল কার্ড পাঠায়। কোনও প্রত্যুত্তর এলে তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে অর্ডার ধরতে। একজন ডেপুটি ম্যানেজার সারাক্ষণ স্যাম্পল কার্ড নিয়ে ব্যস্ত আছেন

হঠাৎ বোম্বে থেকে আসা আমন্ত্রণটি খুঁটিয়ে পড়তে গিয়ে গত তিনবছরের রুদ্ধশ্বাস কাজকর্মের ভেতর একঝলক মুক্ত বাতাস ঢুকে পড়ল যেন। কার্ডটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে একরাশ রোমাঞ্চ প্লেনে যাওয়া-আসা, তার সঙ্গে তিনদিন হোটেলে থাকা-খাওয়ার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে কিষেণলাল রেয়নমিল। গোয়া মানেই বিশাল সি বিচ, তার বালুকা তটে ছড়ানো ছিটোন অথৈ উল্লাসের খোরাক, তার সামনে নীল সমুদ্রে উধাও হওয়ার হাতছানি, সেখানে অজস্র বিদেশী-বিদেশিনীদের বিলাসবিহার—এককথায় কয়েকদিনের স্বর্গসুখ। তাদের কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত এক ডেপুটি ম্যানেজার সেদিন এসে হাসতে হাসতে বলছিলেন, কোম্পানির পয়সায় সেমিনার, মিটিং অ্যাটেন্ড করার মতো আরাম পৃথিবীতে আর নেই।

কথাটা শুনে মনে মনে হেসেছিল রূপম। তার প্রিডিসেসর ভদ্রলোক জাপান গিয়ে যা দুর্নাম করে গিয়েছেন এই কোম্পানিতে, তারই খেসারত দিতে হচ্ছে রূপমকে। তবে হ্যাঁ, সম্প্রতি জাপানের সঙ্গে একটা বড় ব্যবসা করতে চলেছে সে। প্রায় পনের লক্ষ টাকার অর্ডারটা সে বাগিয়েছে প্রায় অতর্কিতেই। গত দশ-বারো দিন ধরে তারই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছে এক্সপোর্ট ম্যানেজার বর্ণিল দত্তগুপ্ত আর চিফ প্রকিওরমেণ্ট ম্যানেজার অরিন্দ্র চট্টরাজের সঙ্গে

কথা বলে। রামপুরহাটের বসোয়ায় একজন অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজারকে পাঠানোও হয়েছে স্যাম্পলসহ, যাতে দ্রুত সাপ্লাই হয় তাদের গোডাউনে।

টেবিলের ডাক ফাইলে হাত দিয়ে সে তখন চোখ বোলাতে শুরু করেছে, পৃথিবীর কোন কোন প্রান্ত থেকে কোয়ারিজ এসে পৌঁছেছে তার কাছে। একে একে হাতে উঠে এল, কানাডা থেকে এক কোম্পানি চায় রকমারি প্রিণ্টেড সিল্কথান। জাপানি-কিমোনো তৈরির জন্য র-থান দরকার এক আমেরিকান কোম্পানির। ইটালির এক ধনী ব্যবসায়ী রকমারি স্যাম্পেল চেয়ে পাঠিয়েছেন স্কার্ট তৈরির উপযোগী সিল্ক কাপড়ের।

ফাইল খুলে চিঠিগুলোর কোণে নোট লিখতে লিখতে রূপম এই সিল্ক সাম্রাজ্যের মধ্যে কিছুক্ষণ ডুবে রইল। যে রেশম বিশ্বব্যাপী কেনাবেচা হয় তার জন্মরহস্য ভারি অদ্ভুত। সামান্য তুঁত পাতা খেয়ে ক্রমশ বড হয়ে ওঠে পলুপোকারা। ক্রমে তারা লালা ঝরাতে ঝরাতে চারপাশে খোলস বা গুটি তৈরি করে তার ভিতর অন্তরিন হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর খোলস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। বেরিয়ে পুনর্বার ডিম পাড়ে তুঁত পাতার ওপর। কিন্তু মজা হল এই যে, খোলস একবার ছিঁড়ে গেলে তা থেকে আর রেশমসুতো পাওয়া যায় না। পুরো গুটিটাই নষ্ট। তাই পোকাগুলো খোলস ছিঁড়ে বেরুবার আগেই গরম জলে চুবিয়ে তাদের মেরে ফেলে সেই খোলস থেকে দুশো-তিনশো মিটার পর্যন্ত লম্বা রেশমসুতো বেরিয়ে আসে।

এহেন সোনালি রেশমের জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ স্মরণাতীত কাল থেকেই লালায়িত। চিঠি আসছে কত কত দেশ থেকে। আমেরিকা, কানাডা, জাপান, ইটালি, মেক্সিকো···

চিঠিগুলো পড়তে পড়তে সে আর একদফা ঘুরে এল গোয়ার সি বিচ থেকে। এও ভাবল, হঠাৎ তাদের মহান ম্যানেজিং ডিরেক্টরের এহেন বিটকেল মতিগতি হলই বা কেন। তাঁর কী এমন ব্যস্ততা থাকতে পারে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে! ব্যক্তিগত কোনও কাজ, না কি পারিবারিক ব্যস্ততা, অথবা আরও আরামদায়ক

কোনও ট্যুর। হয়তো বিদেশেই। এমন ভাবনার মুহূর্তে তার টেবিলে এসে পৌঁছল একটা ভিজিটরস স্লিপ। তাতে লেখা ঃ কারুবাকী মিত্র। উদ্দেশ্য ঃ ব্যক্তিগত।

স্লিপটা দেখে তার ভুরুতে আবার ভাঁজ। এই সাত সকালে ভিজিটর! সাধারণত ফার্স্ট আওয়ারে কোনও ভিজিটর পছন্দ করে না রূপম। অফিসে এসে সে প্রথমেই খুলে বসে টেবিলে ঢিপ হয়ে থাকা ফাইলগুলো। ফাইল শেষ করতে এক দেড়ঘণ্টা লেগে যায় প্রতিদিন। দু-একটা ফাইল খুলে খটকা লাগলে কখনও ডেকে পাঠাতে হয় সংশ্লিষ্ট ডিলিং অ্যাসিস্টাণ্টকে। অন্য অফিসারদেরও কখনও কখনও। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে ফাইল শেষ করতে করতে কখনও তাকে ডেকে পাঠান চেয়ারম্যান কিংবা এম ডি। এত সব পর্ব সারা হতে হতেই টিফিন টাইম।

টিফিনের পরই সাধারণত তাদের কোম্পানিতে ভিজিটরস আওয়ার। প্রায় সব ক্লায়েণ্টরাই তাদের কোম্পানির ভিজিটিং আওয়ারের কথা জানে। জানে বলেই তারা বিকেলের দিকে উঁকিঝুঁকি মারে। অনেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করার পর তার চেম্বারেও দু-চার মিনিটের জন্য মুখ দেখিয়ে যায়। খুব জরুরী কারণ না থাকলে সাধারণত কেউই সকালের দিকে দেখা করার স্লিপ পাঠায় না। কিন্তু খুব চেনা কেউ যদি হয়!

কারুবাকী মিত্র নামটি কেন যেন চেনা চেনা মনে হল রূপমের। কোনও বড় ক্লায়েণ্ট নয়। ছোটখাটো সাপ্লায়ার কিংবা এজেণ্ট হলেও স্লিপে তার উল্লেখ থাকত। ব্যক্তিগত শব্দটা দেখে মনে হল তার পরিচিত কেউ হবে হয়তো।

বেল বাজিয়ে ভিজিটরকে ভিতরে আসার অনুমতি দিতে যে তরুণীটি তার চেম্বারের সুইংডোর ঠেলে ঢুকল, তাকে আগে কখনও দেখেছে মনে হল। স্লিম চেহারা, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের মধ্যে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, সাদা বেসের উপর লাল-নীল ছাপার শাড়ি। তাতে যথেষ্ট সুন্দরীই দেখাচ্ছে তাকে। সিঁথিতে সিঁদুর কিংবা হাতে শাঁখা-পলা না দেখে মনে হল অবিবাহিতাই।

'স্যার, ফার্স্ট আওয়ারে দেখা করতে এসে বোধহয় আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম।'

তরুণীর মুখে স্যার সম্বোধন এবং তার সংলাপটি বলার ধরনে রূপম মুহূর্তে অনুমান করে নিল, মেয়েটি তার পরিচিত তো নয়ই, বরং কোনও প্রার্থীই হবে বা। হঠাৎ এও খেয়াল হল, এই মেয়েটিকেই সে একদিন বসে থাকতে দেখেছে তাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরের বাইরে, সোফায়। তার মানে কোনও প্রার্থীই। অর্ডার চায় অথবা কিছু সাপ্লাই করবে এমন প্রার্থনা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে এম ডি'র কাছে। এসব ক্ষেত্রে তাদের এম ডি যা করেন, কোনও সুন্দরী মহিলা তাঁর কাছে কোনও আরজি নিয়ে এলে তাকে পরপর কয়েকদিন ঘোরান, ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রেখে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যাতে মহিলাকে তাঁর কাছে বারবার ঘুরে ফিরে আসতে হয়। এভাবে টোপ ফেলে বহু মহিলাকে তিনি ধরাশায়ী (শেষে শয্যাশায়ীও) করেছেন এ তথ্য রূপমদের কাছে প্রায়শ জমা হয়ে থাকে।

ফিনান্স অফিসার রমিত ভদ্র মাঝে মধ্যে তার ঘরে আড্ডা মারতে এসে ফিসফিস করে বলেন, 'বুঝলেন, এই যে আমরা সব যার যার চেম্বারে বসে আছি, চারপাশে প্লাইউডের পার্টিশন, আমরাও সব এক একটি পলুপোকা। সারাদিন কথা বলে বলে লালা ঝরাচ্ছি, আর প্লাইউডের খোলস আরও শক্ত করছি রোজ। কিন্তু ভেঙে বেরুতে পারছি না। তার আগেই কোম্পানি আমাদের টেনশনে রেখে, সিদ্ধ করে সোনালি রেশম সুতো ছাড়িয়ে নিচ্ছে আমাদের গা থেকে। আমরা ছিবড়ে হয়ে পড়ে থাকছি মৃত পলুপোকাদের মতো। কোম্পানি সেই সুতোর থান বিক্রি করে লাল হচ্ছে। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম আমাদের এম ডি। সিল্কের যা কিছু রোমান্স সব একা ভোগ করে চলেছেন দিনের পর দিন। ও! পারেনও বটে এই বয়সে।

ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে রূপমের শরীরটা হঠাৎ স্টিফ হয়ে আসে। এই তরুণীও কি তাদের কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অন্যতম শিকার! কিন্তু তাঁর শিকার হঠাৎ জেনারেল

ম্যানেজারের ঘরে এলই বা কোন উদ্দেশ্যে? রূপম তরুণীর আপাদমস্তক বারদুই তীক্ষ্ম চোখে নিরীক্ষণ করে যথাসম্ভব ভদ্রতা দেখিয়ে বলল, বসুন।

কারুবাকী মিত্র একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল বেশ হাসি হাসি মুখেই। তার মুখশ্রীতে যে একটা অতিরিক্ত লাবণ্য মিলমিশ হয়ে আছে এবং হাসলে যে তাকে একটু বেশি সুন্দরী লাগে সে সম্পর্কে সে বোধহয় খুবই সচেতন। সম্ভবত একটু বেশি স্মার্টও। কারণ নতুন একজন অফিসারের ঘরে ঢোকার সময় সাধারণত নার্ভাস বোধ করে মেয়েরা। অতএব ব্যতিক্রমী কারুবাকীকে কিছু অন্যরকম চোখে দেখল রূপম, হুঁ, বলুন—

—স্যার, কয়েকদিন আগে স্টেনোগ্রাফারের জন্য একটা পরীক্ষা দিয়ে গিয়েছিলাম আপনাদের এখানে। সেই ব্যাপারেই এসেছিলাম। ও! তাহলে চাকরির জন্য তদ্বির করতে এসেছে কারুবাকী মিত্র। মাসখানেক আগে তারা সংবাদপত্রে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিল একজন স্মার্ট সুদর্শনা পি এ কাম স্টেনোগ্রাফার চেয়ে। প্রায় দেড়শো অ্যাপ্লিকেশন থেকে বাছাই করে জনাচল্লিশকে একটি লিখিত পরীক্ষায় বসানো হয়েছিল। তাদের রেজাল্ট দেখে ঝাড়াইবাছাই করে দশজনকে ডেকেছিল স্টেনোগ্রাফির টেস্ট দিতে। দশজনের মধ্যে ন'জন হাজির হয়েছিল। দিন পনের আগে সে পাঁচমিনিট করে ডিকটেশন দিয়েছিল প্রত্যেককে। ফাইনাল সিলেকশন করতে যাবে সে-সময় তাকে এম ডি হঠাৎ ডেকে বললেন, সিলেকশনের ব্যাপারটা কয়েকদিন স্থগিত রাখতে রূপম অতএব ফাইলটা ঢুকিয়ে রেখেছে আলমারিতে।

কারুবাকী মিত্র কি তাহলে পরীক্ষার ফল জানতে এসেছে? না কি অন্য কোনও কারণে।

সে তার মগজে একবার ঢেউ খেলাতেই হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল এই ভেবে যে, যে একজন প্রার্থী সেদিন স্টেনোগ্রাফি টেস্টে গরহাজির ছিল সে হয়তো এই মেয়েটিই! আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, লিখিত পরীক্ষার ফল তো নোটিশ-বোর্ডে টাঙানো হয়েছিল, আপনি কি কল পেয়েছিলেন?

কারুবাকী মিত্র তার মুখের হাসি-হাসি ভাবে সামান্য চিড় ধরালো, তবু ঠোঁট জুড়ে একটুকরো টেপা হাসি, হ্যাঁ, পেয়েছিলাম, কিন্তু স্যার, হঠাৎ এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, স্টেনোগ্রাফি টেস্টের দিন হাজির হতে পারিনি।

রূপম তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়ল, তাহলে এখন আর কিছু করার নেই। প্রায় পনেরদিন আগে টেস্ট নেওয়া হয়ে গেছে। সিলেকশনও প্রায় রেডি। এতদিন পর হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কেন ?

—স্যার, দু'দিন পরেই সুস্থ হয়ে দেখা করেছিলাম এম ডি-র সঙ্গে। উনি দেখছি, দেখব করে ক'দিন আসতে বললেন পর পর। তারপর গতকাল বললেন, ফাইল জি এমের কাছে আছে, আপনি ওঁর সঙ্গে দেখা করুন।

এতক্ষণে ব্যাপারটা ধরে নিল রূপম। এম ডি হিরণ সান্যালের যা স্বভাব, নিশ্চয় কারুবাকী মিত্রকে বেশ কয়েকদিন ধরে টাল খাইয়েছেন, কতদূর তা অবশ্য এই মুহূর্তে অনুমান করা সম্ভব নয়। কারুবাকীর হাসির টুকরো লেগে থাকা মুখে একনজর চাউনি ফেলে কী যেন জরিপ করে রূপম বলল, দেখা করে কোনও লাভ নেই মিস মিত্র। দ্য ম্যাটার হ্যাজ বিন ফাইনালাইজড। উই আর স্যরি। কারুবাকী মিত্র অবশ্য তাতে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হল না, চেয়ারে তেমনই অনড় থেকে বলল, স্যার, এম ডি বললেন ব্যাপারটা এখনও ফাইনালাইজড হয়নি। আপনি যদি আমার কেসটা রি-কনসিডার করেন। রূপম আশ্চর্য হল। এম ডি-র হঠাৎ এই মেয়েটিকে 'ফাইনালাইজড হয়নি' বলাটা যতখানি গুরুতর, তার চেয়েও বিস্ময়কর মেয়েটির এই পুনর্বিবেচনা করার প্রস্তাবটি। কণ্ঠস্বরে সামান্য ধমক মিশিয়ে বলল, এখন রি-কনসিডার করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

ধমক খেয়ে কারুবাকীর মুখের হাসি একটু মিলিয়ে এল। তবু চিলতে হাসি লেগেই রইল তার মুখমণ্ডলের কোথাও, এতক্ষণ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলছিল, এবার একটু আকুতি ঝরে পড়ল তার গলায়, স্যার, চাকরিটা ভীষণ দরকার আমার।

এতটাই বিপন্ন হয়ে আছি যে বলে বোঝাতে পারব না।

রূপম বিরক্ত হয়ে উঠল এতক্ষণে, শুধু আপনার নয়, চাকরি আরও বহুজনেরই দরকার। যারা সেদিন স্টেনোগ্রাফি টেস্ট দিতে এসেছিল, তাদের প্রত্যেকেরই দরকার। ন'জন টেস্ট দিয়েছে, চাকরি পাবে তাদের মধ্যে একজন। বাকি আটজন স্বভাবতই অগাধ জলে পড়ে যাবে, বলতে বলতে একটু থামল রূপম। তারপর বলল, তবু যারা পরীক্ষা দিয়েছে তাদের মধ্যে যে কোনও একজন পাবে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে পরীক্ষা দিতে পারেনি, সে তো কোনও মতেই চাকরি পাওয়ার কথা ভাবতে পারে না।

—স্যার, আসার উপায় ছিল না আমার।

—তাহলে অন্তত একটা ইনফর্মেশন পাঠাতে পারতেন। সুস্থ হয়ে একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জমা দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারতেন আপনাকে আলাদাভাবে ডিকটেশন দিয়ে টেস্ট নেওয়ার জন্য। যদি আমাদের বোর্ড অব ডিরেক্টরস অনুমতি দিতেন—

কারুবাকীর মুখের হাসি অনেকখানি নিভে এসেছিল, মুখ নিচু করে বেশ সপ্রতিভভাবেই বলল, আসলে সত্যি কথাটা আপনাকে বলি, স্যার। আমি টাইপ জানি, কিন্তু শর্টহ্যান্ড শিখিনি। সেজন্যেই আমি অ্যাবসেন্ট হয়েছিলাম। রূপম আরও আশ্চর্য হয়ে বলল, তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করলেন কী করে?

—বাধ্য হয়ে মিথ্যে কথা লিখেছিলাম অ্যাপ্লিকেশনে। আমাব একটা চাকরির ভীষণ দরকার ছিল বলেই। এম ডি-র সঙ্গে দেখা করতে উনি বলেছিলেন অ্যাপ্লাই করো। আমি দেখব।

বাহ্, অপূর্ব! রূপম তার সামনে বসা কারুবাকী মিত্রের চেহারাটার দিকে আর এক ঝলক নজর রাখল। শরীরের বাঁকটাক-গুলো এমন আকষর্ণীয় করে রেখেছে পোশাকের আড়ালে যাতে যে কোনও পুরুষকে ঘায়েল করে দেওয়া যায়। কিন্তু রূপম একটু অন্য ধাতে গড়া। তাদের এম ডি-র কাছে এহেন চেহারা নিয়ে ঘুর ঘুর করলে কিছু সুবিধে পেলেও রূপমের কাছে সম্ভব হবে না। সে আবারও ধমক দিল, অবশ্যই মৃদুভাবে, আপনার সাহস দেখে

অবাক হচ্ছি। ঠিক আছে, এখন যেতে পারেন, এভাবে বসে থেকে কাজের ক্ষতি করবেন না।

এমত রূঢ়ভাষণের পর অন্য কোনও মেয়ে নিশ্চিত ঘর ছেড়ে চলে যেত, কিন্তু কারুবাকী তবুও অনড়, স্যার, কোনও উপায়ে চাকরিটা দিতেই হবে আমাকে। এম ডিকে বলেছি, ছ'মাসের মধ্যে শর্টহ্যান্ড শিখে নেব। ওঁর কোনও আপত্তি নেই। শুধু আপনি রাজি হলেই—

রূপমের ধৈর্য শেষ হয়ে আসছে দ্রুত। নেহাৎ মেয়ে বলেই কারুবাকী এখনও তার সামনে বসে থাকতে পেরেছে। এহেন অন্যায় আবদার কোনও পুরুষ প্রার্থী করলে নিশ্চিত ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিত। কিন্তু সে এও ভেবে অবাক হচ্ছে, এম ডি-র কাছ থেকে মেয়েটি কতখানি প্রশ্রয় পেয়েছে ইতিমধ্যে। শর্টহ্যান্ড জানে না এমন মেয়েকে স্টেনোগ্রাফার পোস্টে চাকরি দিলে তাদের কোম্পানিতে যে কী পরিমাণ হৈ চৈ বেধে যাবে তা এম ডি বোধ হয় অনুমান করতে পারছেন না। ভীষণ বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠল, আপনি এখন যাবেন কি যাবেন না?

রূপমের শক্ত চোখমুখ, রাগত কণ্ঠস্বর, ক্রুদ্ধ ভঙ্গিমা দেখে কারুবাকী এতক্ষণে নিরাশ হল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বার করল একটা কাগজ, সেটা রূপমের সামনে রেখে বলল, ঠিক আছে স্যার, আমি আজ চলে যাচ্ছি। তবে এম ডি আমাকে এই কাগজটা দিয়ে বলেছিলেন, দু-প্যারাগ্রাফ ইংরাজি লেখা শুদ্ধভাবে টাইপ করে আপনার কাছে জমা দিয়ে যেতে। সেদিন আমাকে অ্যাবসেন্টের বদলে প্রেজেন্ট করে আপনার ফাইলের ভেতর এই শীটটা রেখে দিলে কেউ বুঝতেই পারবে না কিছু। এম ডি-র যখন আপত্তি নেই, তখন শুধু আপনি বাদ সাধছেন কেন। আমার বাড়ির অবস্থা এতটাই খারাপ যে বাধ্য হয়ে এতখানি নীচে নামতে হচ্ছে আমাকে।

বলে আর দাঁড়ালো না। 'থ্যাংকু স্যার' বলে কাঁধের যথাস্থানে ভ্যানিটি ব্যাগটি ঝুলিয়ে মৃদুপায়ে বেরিয়ে গেল। রূপম আশ্চর্য হয়ে দেখল, কাগজটির কোণে তাদের অফিসেরই সিল মারা। এককোণে

এম ডি-র ইনিসিয়াল। সেদিন ডিকটেশন দেওয়ার পর তা টাইপ করার জন্য প্রার্থীদের হাতে যে কাগজ এক এক শীট সে দিয়েছিল, তারই একটি এম ডি নিজেই কারুবাকী মিত্রকে দিয়েছেন দেখে তার শরীর নিথর হয়ে গেল। এম ডি যদি এই মেয়েটিকেই কোম্পানিতে চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, লিখিত পরীক্ষা নিয়ে, স্টেনোগ্রাফির স্পিড টেস্ট করে এতসব ফার্স করার কী দরকার ছিল। শুধু শুধু কিছু ছেলেমেয়েকে চূড়ান্তভাবে হয়রানি করা। তা ছাড়া, এম ডিই বা হঠাৎ কারুবাকী মিত্রকে দেখে এতখানি গলে গেলেন কেন! অন্য যেসব মেয়েরা পরীক্ষা দিতে এসেছিল তাদের ভেতর সুন্দরীও কম ছিল না। সেক্ষেত্রে তাদের কাউকে নির্বাচিত না করে কারুবাকীকে পক্ষপাতিত্ব করার মতো এতখানি রিস্ক নিতে গেলেনই বা কেন? তাহলে কারুবাকীর সঙ্গে কি কোনও বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে হিরণ সান্যালের!

চুয়ান্নবছর বয়সী ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিরণ সান্যালের চরিত্রগত দোষ এই কোম্পানিতে আপাতত কিংবদন্তী। প্রায় দশবছর আছেন কোম্পানিতে। তাঁর চেম্বারে ও চেম্বারের বাইরে নিত্যনতুন মহিলাদের আনাগোনা, তাদের অপেক্ষারত থাকার দৃশ্য দেখে অন্য অফিসার ও কর্মীদের মধ্যে ফিসফিসানি চলে, কাকে কোন টোপ ফেলে গাঁথতে চাইছেন উনি। কখন কোন মহিলাকে ওঁর গাড়িতে দেখা গেছে। কাকে বসিয়ে রেখেছেন বিকেলে একসঙ্গে ফিরবেন বলে।

আর পারেনও ভদ্রলোক। এতসব গুঞ্জনের কিছু কিছু কোনও না কোনওভাবে ওঁর কানে নিশ্চয়ই পেঁছয়। পেঁছে দেওয়ার লোকেরও অভাব নেই। কিছু পেটোয়া লোক কোম্পানির বিভিন্ন সেকশনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যারা কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে তা ওঁর কানে দ্রুত পেঁছে দেওয়ার জন্য সদাপ্রস্তুত। তবু সবকিছু জেনে শুনেও কোনও পরোয়া করেন না ভদ্রলোক। এর আগে কোন এক কোম্পানিতে নিজের চেম্বারেই নাকি তাঁকে আবিষ্কার করা হয়েছিল সেখানকার এক মহিলা কর্মীর সঙ্গে

আপত্তিকর অবস্থায়। তারপর ইউনিয়নের চাপে পড়ে সেখান থেকে রিজাইন দিয়ে চলে যেতে হয়েছিল অন্যত্র। তাতেও কাণ্ডজ্ঞান হয়নি। এখনও, এই বয়সেও দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন আগের মতো। আর চেহারাটাও রেখেছেন বেশ হ্যাণ্ডসাম ধরনের। পাঁচ-নয়ের দীর্ঘ মেদহীন শরীরে এখনও যুবকসুলভ হাঁটাচলা, চাউনি, কথাবার্তা। চুলে পাক ধরেনি, না কি কলপ লাগান নিয়মিত তা বোঝা যায় না। নিপুনহাতে দাড়িগোঁফ শেভ করায় ফর্সা গালে সবুজ ছোপ ধরে থাকে। তাতে আরও আকষর্ণীয় হয়ে ওঠে চেহারাটা। মুখে প্রায় সর্বক্ষণ সিগারেট। কথাও বলেন একটু চিবিয়ে চিবিয়ে। সব মিলিয়ে তাঁর এই দর্শনধারী উপস্থিতিটি মেয়েদের কাছে নাকি ভারী অ্যাট্রাকটিভ।

মেয়েদের আকর্ষণ করার এই প্রাথমিক অস্ত্রটি তাঁর সহজাত তো আছেই, উপরন্তু উচ্চপদে আসীন থাকার জন্য আরও যে অমোঘ অস্ত্রটি তিনি প্রয়োগে সক্ষম তা হল কাউকে কিছু পাইয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। কাউকে এজেন্সি কিংবা ডিলারসিপ পাইয়ে দেওয়া, অথবা কেউ বুটিকের কাজ জানে তাকে সিল্কথান দিয়ে মজুরির বিনিময়ে শাড়ি ব্লাউজপিস সালোয়ার কামিজের অর্ডার দেওয়া, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে তাঁর জানাশুনো থাকায় কাউকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া, কাউকে সল্টলেকে জমি পাইয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

ম-বর্ণটির উপর তাঁর এই অত্যানুরাগে কখনও বেআইনী কাজ করতেও পিছপা হন না, কখনও কর্মীদের ওপরও তাঁর হুকুম বর্ষিত হয় অনিয়ম করার জন্য। ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদটি যেহেতু এ ধরনের কোম্পানিতে প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন, আড়ালে কানাকানি গুঞ্জন চললেও তার বহিঃপ্রকাশ হয় না বড় একটা। ইউনিয়নের নেতা বচন তরফদার দু-একবার ডেপুটেশন দিতে গিয়ে বক্তৃতার তোড়ে কখনও ইঙ্গিত দিয়ে থাকলেও আজ পর্যন্ত সরাসরি চার্জ করেনি তাঁকে।

না করার কারণও অবশ্য থাকে। ম্যানেজিং ডিরেক্টররা সাধারণত তাঁদের নানান গুণাবলী ঢাকতে এই সব নেতাদের রসেবসে

রাখেন। সে-সব খবর সাধারণ কর্মীরা না জানলেও রূপমের মতো আরও অনেক অফিসার জানে। অতএব ইউনিয়নের নেতারাও যে বেশি ট্যাঁ-ফো করবে না তাও নিশ্চিত।

সাত পাঁচ এত সব ভাবনা মাথায় গেরো দিতে দিতে মেজাজটা খিঁচড়ে থাকে রূপমের। এই জন্যেই ফার্স্ট আওয়ারের দিকে সে কোনও ভিজিটর অ্যালাউ করে না। খুব জরুরি না থাকলে পারতপক্ষে কোনও স্টাফকেও ডাকে না আলোচনার জন্যে। ফিচেল মেয়েটা তার সামনে থেকে উঠে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্তও সে থম হয়ে বসে রইল একটা ফাইল খুলে। অফিসে এরকম উটকো ঝঞ্ঝাট প্রায়ই না আসে তা নয়, তবে তাতে এতটা টালমাটাল কখনও হয় না। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা একটু বেশি রকমের উটকো এই কারণে যে মেয়েটা দু-তিনবার এম ডি-র প্রসঙ্গ তুলেছে। এম ডি কারুবাকী মিত্রকে এতটা প্রশ্রয় দিয়েছে জেনেই সে এতখানি বিচলিত, ক্ষুব্ধ। রূপম বেনিয়ম একেবারেই পছন্দ করে না। কাজের ব্যাপারে সে শুধু সততা কিংবা আইনসম্মত হওয়া পছন্দ করে তা নয়, সে প্রচণ্ড পরিশ্রমী আর নিষ্ঠাবান। তার যতখানি এফিসিয়েন্সি তার সবটাই উজাড় করে ঢেলে দেয় কোনও প্রকল্প হাতে এলে, যতখানি সম্ভব ছোটাছুটি করে কাজ তুলে দেয় কিন্তু চলার পথে কোনও নিয়ম বহির্ভূত কাজকে প্রশ্রয় দেয় না।

একটু পরেই তার মনে হল, তাহলে এই জন্যেই কি ক'দিন আগে এম ডি তাকে সিলেকশনের কাজটা আপাতত মুলতুবী রাখতে বলেছিলেন। নিশ্চয়ই তাইই, ভাবতেই তার শরীর আবার শক্ত হয়ে ওঠে। টিফিন পর্যন্ত কোনও কাজেই মন লাগাতে পারে না। হঠাৎ কেমন যেন ধূসর, শূন্য হয়ে যায় তার চোখের দৃষ্টি। টিফিনের পর চেয়ারম্যান তাঁর ঘরে ডেকে কতকগুলো জরুরি কাজ দিলেন, সেগুলো নিয়েই ব্যস্ত হতে চেষ্টা করল একমনে। এম ডি-র সঙ্গে কয়েকটা আলোচনা ছিল, সেগুলোও কোল্ডস্টোরেজে চালান করে দিল আপাতত এম ডি-র কথা ভাবলেই শরীরে স্টিফনেস্‌টা ফিরে আসছে বারবার।

একেবারে শেষ আওয়ারে হঠাৎ টেলিকমে পিঁক পিঁক আওয়াজ হতেই সম্বিত ফিরে এল রূপমের। অনেকক্ষণ ধরে বাজছে শব্দটা, সে এতটাই অন্যমনস্ক, বুঁদ হয়ে ছিল যে শুনতেই পায়নি এতক্ষণ। বোতাম টিপে রিসিভার কানে লাগাতেই শুনল এম ডি-র গলা, কী ব্যাপার রূপম, ঘরে ছিলে না নাকি ?

রূপম নিজেকে সামলে নেয় দ্রুত, নাহ, ছিলাম তো—

—ওহ্, তাহলে ফাইলের ভেতর ডুবে ছিলে নিশ্চয়ই।

রূপম থই খুঁজে পায় যেন, হ্যাঁ, ওই সুইজারল্যান্ড থেকে যে কোয়ারিটা এসেছে—

—ঠিকই ধরেছি তাহলে আমি, এম ডি হাসলেন একটু, কাজে তুমি এতটা ইনভলভড্ হয়ে পড়ো আজকাল। আমি সেদিন চেয়ারম্যানকেও বলছিলাম জি এম এতটা কাজ-পাগল যে ওয়াইফকেও বোধহয় এতটা সময় দেয় না। যাই হোক, কারুবাকী মিত্র বলে একটা মেয়ে দেখা করেছিল আজ ?

রূপম স্তব্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সে একমুহূর্তের জন্য, তারপর বলল, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সকালের দিকে এসেছিল একবার।

—ব্যাপারটা দেখো তো। যদি দরকার হয় আমার সঙ্গে ডিসকাশন করে নিও একবার। বলেই লাইনটা কেটে দেন এম-ডি। এইরকমই স্বভাব ওঁর। যাতে শ্রোতা কোনও রি-অ্যাকশন তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে না পারে বোধহয় শ্রোতাকে সেকেন্ড থট্ দেওয়ার জন্য সময় দেন। রূপমের যা স্বভাব, তাতে সে চট করে না-ই বলবে তা এম ডি জানেন বিলক্ষণ। তাইই একটু সময় দিতে চাইলেন যাতে দ্বিতীয় বারের ভাবনায় রূপম তার মত বদলাতে পারে।

রিসিভার হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বিমূঢ় হয়ে বসে রইল সে। নিয়মবিরুদ্ধ কাজ তার হাত দিয়ে হবে না জেনেও এম ডি তাকে এহেন একটা অনুরোধ করতে গেলেন কেন! এম ডি এই সংস্থার এক্সিকিউটিভ হেড। তিনি তো ইচ্ছে করলেই রূপমের কাছ থেকে ফাইল চেয়ে নিয়ে নিজেই যা ম্যানিপুলেশন করার করতে

পারতেন। তাঁর জন্যই পি এ কাম স্টেনোগ্রাফার নেওয়া হচ্ছে যখন……

ভাবতে ভাবতে রূপমের ঠোঁটে একটুকরো হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল হঠাৎ। আসলে এবার অ্যাপয়েন্টমেন্টের যাবতীয় ব্যাপারটা বোর্ড অব ডিরেক্টরসের মিটিঙে জেনারেল ম্যানেজারের কাছেই অর্পিত হয়েছিল। কোশ্চেন তৈরি করা থেকে ডিকটেশন দেওয়া পর্যন্ত। শুধু ফাইনাল ইন্টারভিউয়ের সময় এম ডি থাকবেন—

এখন কারুবাকী মিত্র যেহেতু স্টেনোগ্রাফি টেস্টের সময় অ্যাবসেন্ট ছিল তখন এক রূপমই পারে এই ম্যানিপুলেশনটি করতে। তাহলেই ইন্টারভিউয়ের সময় কারুবাকী মিত্রকে পছন্দ করতে পারেন এম ডি।

যে মুহূর্তে রূপম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, কাল অফিসে এসে প্রথমেই সে এম ডিকে টেলিকমে জানিয়ে দেবে, সে কোনও মতেই কারুবাকী মিত্রকে অ্যাকোমডেট করতে পারছে না. ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল তার টেবিলে। রিসিভার কানে দিয়েই বুঝল, বাইরের কল। আর তা অরুণিমার—

অরুণিমা প্রায়ই বিকেলের দিকে তাকে একবার ফোন করে থাকে। সে অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরছে কি না, অথবা যদি ঘুরে আসে ঠিক ক'টার সময় ফিরবে, এইসব জেনে নেওয়া তার বরাবরের অভ্যাস। আজ কিন্তু অরুণিমার গলায় উৎকণ্ঠা তুমি এক্ষুনি চলে আসতে পারবে?

—কেন, কী হল? রূপমও তার গলায় উদ্বেগ জড়ো করে ফেলল।

—খুব বিপদ হয়েছে মনে হচ্ছে। চট করে বেরিয়ে পড়ো—

—বিপদ, কী বিপদ! রূপমের মেরুদণ্ডে একটা শিরশির করা রক্তস্রোত ছুটে যায়, টিটোর শরীর খারাপ নাকি?

—না।

—তাহলে?

—সব কথা এখন টেলিফোনে বলা যাবে না। তুমি এক্ষুনি

চলে এসো। বহরমপুর থেকে একটা চিঠি এসেছে। তুমি শিগগির চলে এসো। আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছে।

আর সংলাপ না বাড়তে দিয়ে ওদিকে টেলিফোন রেখে দিয়েছে অরুণিমা রূপমকে একরাশ বিস্ময়, উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের মধ্যে ফেলেই। কী হল বহরমপুরে! বাবার শরীর খারাপ, না কি মা'র ? অথবা তার ভাইবোনের কারও কিছু।

২

স্কুলবাস থেকে টিটোকে নামিয়ে অন্যদিনকার মতোই নিরুদ্বেগে ফ্ল্যাটে আসছিল অরুণিমা। তাদের ফ্ল্যাট তিনতলায়, অভ্যাসমতো সিঁড়িতে ওঠার আগে তাদের থ্রী বাই এ ফ্ল্যাটের লেটার বক্সের দিকে চোখ রাখতেই মনে হল, চিঠি আছে। তালা খুলে খামটা বার করতেই বুঝে গেল রূপমের মায়ের চিঠি। দু-তিনমাস পর পর বাড়ির খবরখবর জানিয়ে চিঠি লেখেন তার শাশুড়ি। চিঠির দুই-তৃতীয়াংশে যা লেখা থাকে তার মর্মার্থ, রূপমের ভাই শৌভিকের জন্য একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে হবে। ইদানীং তার সঙ্গে আর একটি অনুচ্ছেদ যোগ হয়েছে, বোন বলাকার এ বছরই এম এ ফাইনাল, তার বিয়ের ব্যবস্থাপনাও করতে হবে রূপমকে। কারণ রূপমের বাবার আর সংসারের প্রতি মনোযোগ নেই।

প্রতিবারই চিঠি পড়তে পড়তে গম্ভীর হয়ে যায় অরুণিমা এ ছাড়া রূপম সম্পর্কে যেন আর কোনও ভাবনাই নেই ভদ্রমহিলার। রূপম যেহেতু বড় ছেলে, অতএব তাকে মাস মাস টাকা পাঠাতে হবে বাড়িতে, ভাইয়ের চাকরি করে দিতে হবে, বোনের বিয়ে দিতে হবে।

আজও সেই একই মানসিকতা নিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকেই খামের মুখ ছিঁড়ে ফেলেছিল সে। কিন্তু এবারে চিঠির দু-চারলাইন এগোতে

না এগোতে তার বুকের ভেতরটা ছাঁত করে উঠল হঠাৎ। হাতের আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। মুখটা সাদাও হয়ে গেল বোধহয়। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন তুলে রূপমকে বলল, শিগগির চলে এসো তো. খুব বিপদ।

ঠিক এহেন একটা দুর্যোগ যে সত্যি সত্যি ঘনিয়ে আসতে পারে তা কখনও ভাবেনি অরুণিমা এব আগে রূপমের বাবাকে নিয়ে কোনও আলোচনা উঠলে তা সযত্নে এড়িয়ে যেত রূপম। পসঙ্গটা এতই অস্বস্তিকর যে রূপম ভুলে থাকতে চাইত। অরুণিমা শেষপর্যন্ত রাগমাগ করে বলত, ব্যাপারটা এভাবে ধামাচাপা দিয়ে আর কতদিন রাখবে? তোমার উচিত বাবার সঙ্গে এটা নিয়ে আলোচনা করা। অন্তত তোমরা যে ঘটনাটা জেনে ফেলেছ তা আকারে ইঙ্গিতে ওঁকে জানিয়ে দাও—

রূপম যদি তখন অরুণিমার কথা শুনত, তাহলে হয়তো আজ এহেন বিশ্রী পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না তাদের। চিঠিটা পড়ার পর থেকেই অরুণিমা স্তম্ভিত। ভেবেই পাচ্ছে না, এর পব কী হবে, কী হতে পারে, কী করা উচিত এখন। টিটো স্কুল থেকে রোজ ফিরে আসার পর প্রথমেই তার জন্য টিফিন গোছাতে বসে। আজ তার মাথায় চিন্তাগুলো এমন অদ্ভুতভাবে জট পাকিয়ে গেল যে টিটোর কথা ভুলেই গিয়েছিল বেমালুম। কতক্ষণ পরে কে জানে টিটোই এসে মনে করিয়ে দিল, মা, খেতে দেবে না?

কোনওক্রমে ফ্রিজ থেকে একটু বেলায় তৈরি টিটোর প্রিয় খাদ্য চাওমিন বার করে দ্রুত গ্যাস জ্বালিয়ে সেটা গরম করে ফেলল অরুণিমা। প্লেটে সাজিয়ে ডাইনিং টেবিলে রেখে ফ্যাসফেসে গলায় ডাক দিল, টিটো—

টিটো খাবারের প্লেট ধরতে ধরতে বলল, কে চিঠি দিয়েছে মা? আম্মা?

ঠাকুমাকে আম্মা বলে টিটো। লেটারবক্সের চিঠি পাওয়ার পর থেকে মায়ের প্রতিক্রিয়া দেখে হয়তো সেও প্রবল অস্বস্তিতে আছে। ঠাকুমার চিঠি আসার দিনে তার মায়ের সঙ্গে বাবার

একটা ছোটখাটো কোল্ডওয়ার হয়ে থাকে, তা স্থায়ী হয় রাতে ঘুমোনোর আগে পর্যন্ত। এটা সে দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ করেছে। কিন্তু আজ মায়ের মুখ দেখে মনে হল, ব্যাপারটা আগের আগের চেয়ে ঢের সিরিয়াস।

অরুণিমা টিটোর কথার কোনও উত্তর দিল না দেখে টিটো অতঃপর তার চাওমিনের প্লেটেই মনঃসংযোগ করল।

বার দুই ড্রইংরুমে টাঙানো শৌখিন দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে থাকে অরুণিমা। রূপমের ফিরতে প্রায়ই দেরি হয়ে যাচ্ছে আজকাল। আগে সাড়ে ছ'টার মধ্যেই ফিরে আসতো। আজকাল সাতটা সাড়ে সাতটাও হয়ে যাচ্ছে রোজ। জিজ্ঞাসা করলে মুখে ভারিক্কি ভাব এনে বলে. প্রাইভেট কোম্পানিব হালচাল তো জানো না, যত উপরে উঠবে, তত রেসপনসিবিলিটি, তত কাজ। এখন কোম্পানির উঠতি স্টেজ। হু হু করে এক্সপোর্ট বাড়ছে। কাজও বেড়ে যাচ্ছে রোজ। এরপর হয়তো আরও দেরি হবে—

সেইজন্যেই পাঁচটা নাগাদ ফোন করে দিয়েছে অরুণিমা, যদি তাতে অন্তত একদিন একটু আগে আগে ফেরে রূপম। কিন্তু ছ'টা বাজতে চলল তবু—

রূপম এসে পৌঁছল ছ'টা বেজে দশে। ফ্ল্যাট বাড়ির নীচে ছোট্ট করে পিঁক শব্দ হতেই তিনতলার জানালা থেকে মুখ বাড়ালো অরুণিমা। দেখল. সকালে যে নীল অ্যাম্বাসাডারটা এসে রূপমকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেটাই।

তার একটু পরেই কলিং বেলে টুংটাং পিয়ানোর শব্দ। অরুণিমা থমথমে মুখে দরজা খুলে দিয়ে ভেতরে চলে এল প্রায় অবশ পায়ে।

রূপম তার অ্যাটাচি নামিয়ে রেখে পা থেকে জুতো মোজা খুলল। বেডরুমের দিকে যেতে যেতে বলল, কই, দেখি—

কোনও কথা না বলে বিছানার তলা থেকে খামখানা বার করে অরুণিমা এগিয়ে দিল রূপমের দিকে। রূপম ছেঁড়া খামের ভেতর থেকে চিঠিটা বার করে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল। তার

মায়ের গোটা গোটা করে লেখা অক্ষরগুলোর ওপর নজর রাখতেই প্রথমে দুই ভুরু জুড়ে কোঁচ, তারপর সাদা হয়ে গেল মুখখানা। বোধহয় ব্যাপারটা প্রথমে অবিশ্বাস্য, তারপর ঘটনার ভয়াবহ পরিণতি ভেবে সেও বিমূঢ়, স্তব্ধ হয়ে গেল। অরুণিমার দিকে তার পাংশু হয়ে যাওয়া মুখখানা একবার রেখেই আবার চোখ রাখল চিঠির ওপর। তারপর সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে।

অরুণিমা এতক্ষণ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল রূপমের প্রতিক্রিয়া। এবার আছড়ে পড়ল সশব্দে, আমি জানতাম এরকম কিছু একটা হবে।

রূপম অরুণিমার দিকে চোখ ফেরাল। প্রায় অসহায়ের মতো। অরুণিমা এতক্ষণ নিজের ভেতরে তোলপাড় হচ্ছিল। রূপমকে সামনে পেয়ে আর সামলাতে পারল না, বলে উঠল, ছি ছি, আর ক'দিন পরেই যাঁর রিটায়ার করার কথা, তিনি কিনা এই বয়সে—, এরপর আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখাবো কী করে?

রূপম তখনও চিঠির অক্ষরগুলোর দিকে ঝাপসা চোখ রাখছে। চিঠিটা বহরমপুর থেকে পোস্ট করা হয়েছে সতেরই ডিসেম্বর, এখানকার পোস্ট অফিসের ছাপ একুশে। হয়তো ভাবতে চেষ্টা করছে, মায়ের চিঠি পোস্ট করার পর হয়তো এতদিনে পরিবর্তন হয়েছে পট। চোদ্দ তারিখে তার বাবা যথারীতি খাওয়া-দাওয়া সেরে স্কুলে গিয়েছিলেন, তারপর আর বাড়ি ফেরেননি। কোথায় গেছেন, কেন গেছেন তার কিছুই বলে যাননি বাড়িতে। তার মা অলকাদেবী আর ভাই শৌভিক যতদূর সম্ভব খোঁজ খবর করেছে। স্কুলে গিয়ে জানতে পেরেছে দীর্ঘ ছুটির দরখাস্ত দিয়ে তার বাবা শিবপ্রসন্ন রায় চোদ্দ তারিখ স্কুলের পড়ানোয় দায়িত্ব সেরে ঠিকঠাক বেরিয়ে এসেছেন স্কুল-ছুটির পর। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি।

বাড়ি না ফেরার কারণ অরুণিমাও বুঝে নিয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে তাদের কানে এসেছিল, রূপমের বাবা হঠাৎ এক মহিলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন কীভাবে যেন। বহরমপুর

থেকে কয়েকমাইল ভেতরে এক গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা এই তিরিশোর্ধ মহিলা, বেশবাস, চেহারা দেখে অনুমিত হয় অবিবাহিতাই। আপাতত বহরমপুরেই থাকেন আলাদা বাসাভাড়া নিয়ে। আগে কলকাতায় থাকতেন, কয়েকবছর আগে চাকুরিসূত্রে মুর্শিদাবাদ জেলায় আসার পর আলাপ হয়েছে শিবপ্রসন্নের সঙ্গে। তারপর প্রায়ই একসঙ্গে দেখা যাচ্ছিল দু'জনকে। খুব সম্প্রতি মহিলা নাকি এ জেলার চাকরি ছেড়ে অন্য কোথাও চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, ঠিক তার কয়েকমাসের মধ্যেই শিবপ্রসন্নের এই অন্তর্ধানের একটাই অর্থ, শিবপ্রসন্ন সেই মহিলার কাছেই চলে গিয়েছেন।

গত কয়েকমাসে আরও দুতিনবার রূপমের 'বাবা কলকাতায় যাচ্ছি' বলে বেরিয়েছিলেন বহরমপুর থেকে কিন্তু কখনই রূপমদের ফ্ল্যাটে এসে ওঠেননি। ব্যাপারটা জেনে যেমন আশ্চর্য হয়েছে রূপমের মা-ভাই-বোন, তেমনি রূপম আর অরুণিমাও। কলকাতায় এসেছেন, অথচ ছেলের বাড়ি না উঠে কোথায় উঠতে পারেন ভেবে দিশেহারা হয়েছে সবাই। রূপমের মা দু-একবার জিজ্ঞাসা করেও তেমন সদুত্তর পাননি স্বামীর কাছ থেকে। তখন থেকেই একটা অদ্ভুত সন্দেহের ছায়া ঘুরপাক খাচ্ছিল সবার মনে। কিন্তু তার পরিণতি যে এই পর্যায়ে উঠতে পারে তা ভাবতেই পারেনি কেউ। এখনও রূপম যেন ঠিক ভাবতে পারল না। ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল, তিনদিন ফেরেনি বলে আর ফিরবেন না, তাই বা কেন ভেবে নিল মা ?

অরুণিমা ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল, ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, বোঝাই তো যাচ্ছে বেশ। প্রতিবার বাড়ি থেকে অন্তত বলে বেরোতেন। এবার কারও সঙ্গে কিছু বলা নেই, স্কুলে দীর্ঘ ছুটির দরখাস্ত দিয়ে বলে গেছেন, কবে জয়েন করবেন বলতে পারছেন না, এরপরও কি আর সন্দেহের অবকাশ থাকে ?

ক্ষীণ আশা ছিল রূপমের মনে, হঠাৎ ঝিম মেরে গেল অরুণিমার ঝঙ্কারে। শরীরটা শিরশির করে উঠল যেন। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এখন কী হবে বলো তো ?

কী হবে, তাই ভেবে ভেবেই তো অরুণিমা এতক্ষণ জেগে

জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছে। বহরমপুরে একটা ভাড়া বাড়িতেই ভদ্রলোক কাটিয়ে গেলেন প্রায় চল্লিশ বছর। কখনও বাড়িটাড়ি করে থিতু হওয়ার কথা ভাবেননি। রূপমের স্কুলজীবন কেটেছে ওই ভাড়াবাড়িতেই। তারপর কলেজে পড়তে সেই যে চলে এসেছিল কলকাতায় হোস্টেলে, তারপর বছরে দু-তিনবার যাওয়া ছাড়া তেমন যোগাযোগ নেই বহরমপুরের সঙ্গে। তবে মাসে মাসে মানি-অর্ডারে কিছু কিছু টাকার জোগান দিয়ে গেছে ভাইবোনদের পড়ার খরচ হিসেবে। ভাই শৌভিক বি এ পাশ করার পর তিন চার বছর চেষ্টা করেও কোনও কাজের সংস্থান করে উঠতে পারেনি। বোন বলাকাও বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে। ঠিক এহেন মুহূর্তে শিবপ্রসন্ন সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার অর্থ গোটা সংসারটাই অথৈ জলে পড়া। কীভাবে এই সংসার চলবে এখন, সেই ভাবনাতেই আগাগোড়া ভরা রয়েছে রূপমের মা অলকাদেবীর চিঠিতে। চিঠিটা পড়ার পর থেকে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে অরুণিমারও। রূপমের কথা শুনে ফুঁসে উঠে বলল, তোমার অপোগণ্ড ভাইটি একটি চাকরিও জোটাতে পারলেন না এতদিনের মধ্যে। পারবেনই বা কী করে! সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে, নাটকের দল করে বেড়ালে চাকরি হবে কোত্থেকে?

আরও কিছুক্ষণ ভাবনায় উথালপাথাল হয়ে রূপম বলল বাড়িওয়ালা এমনিতেই ঝামেলা পাকাচ্ছিল ওদের সঙ্গে, এখন সুযোগ বুঝে হয়তো উঠিয়েই দেবে—

অরুণিমা এরকম একটা ভয়ই করছিল মনে মনে। থম হয়ে বলল, কেন উঠিয়ে দেবে কেন? তোমার বাবা ভাড়া দিতেন না মাস মাস?

হ্যাঁ, দিতেন অবশ্য নিয়ম করে, মাস পয়লায়। কিন্তু চল্লিশ বছর আগে যে বাড়ির ভাড়া ছিল দেড়শো টাকা, বাড়তে বাড়তে এখন মাত্র আড়াইশো টাকায় ঠেকেছে। বাড়ির মালিক এখন এক হাজার টাকায় ভাড়া দিতে পারবে।

প্রায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে শুনছিল অরুণিমা। এ নয় যে সে

ভাড়াবাড়ির এত কুটকচালি জানে না। কিন্তু এসব প্রসঙ্গ নতুন করে আলোচনার অর্থ যে সম্ভাবনার ভয় তাদের এই মুহূর্তে কুরে কুরে খাচ্ছে, তা বড় বেশি প্রকাশ্যে চলে আসা। রূপমের কণ্ঠস্বর থেকে সেই ভয় ঝরে পড়ছিল যেন। একটু থেমে, অরুণিমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে প্রকাশ করে ফেলল সেই অমোঘ আশঙ্কা, যদি সত্যি সত্যি ওদের ঘরছাড়া করে দেয় তাহলে কী হবে কে জানে।

কী হবে মানে. যে সত্যটি রূপম মুখ ফুটে বলতে পারছিল না সে কথা তীব্রভাবে উপছে পড়ল অরুণিমার গলায়, তা হলে সব দলবল নিয়ে বাক্স পেটরা সাজিয়ে এখানে এসে তো উঠতে পারে না —

অরুণিমার গলায় এমনই একটা ব্যঙ্গ আর ভয় ওতপ্রোত হয়ে ছিল যে তা প্রায় সপাটে আছড়ে পড়ল রূপমের চোখে মুখে। রূপমকে এসময় প্রবল অসহায় দেখায়। তাদের এই নতুন কেনা ফ্ল্যাট, সর্বসাকুল্যে আটশো স্কোয়ার ফুটও হবে না। একটা বড়, একটা ছোট বেডরুম, তার সঙ্গে মাঝারি সাইজের লিভিংরুম, যার একদিকে তারা ডাইনিং হিসাবে ব্যবহার করে। এতটুকু পরিসরের মধ্যে তারা তিনজন ছাড়া চতুর্থ ব্যক্তি কখনও এলে এ ঘরের পক্ষে বাড়তি বলে মনে হয়।

অরুণিমা তৎক্ষণাৎ আবারও তীব্র হল, ও বাড়িতে থাকার জায়গা না হয়, অন্য কোথাও বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকবে। যত সহজে বলল অরুণিমা, রূপম তাতে থিতু হতে পারল না। তার আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হল, অন্য জায়গায় উঠে যাবে বললেই তো হল না। অত টাকা বাড়িভাড়া দেবেই বা কীভাবে ওরা মাসে মাসে! তার ওপর সংসার খরচ—

বলতে বলতে রূপমকে প্রায় আহত জন্তুর মত ছটফট করতে দেখে অরুণিমা। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে জামা-প্যান্টও বদলাতে পারেনি আজ। সোফার ওপর হতাশ হয়ে বসে আছে, চোখে শূন্য দৃষ্টি, মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে মুঠো করে ধরছে মাঝে মধ্যে।

অরুণিমাও তো বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে নিজের মধ্যে, বোধহয় তাই তার গলার স্বর আরও তীক্ষ্ম হল, তা সে ঘর ভাড়া, সংসার খরচ সব তোমাকেই জোগাতে হবে ভাবছ নাকি ?

রূপম ভাবতে চাইছে না, তবু মাথায় এক এক ঝলক চক্কর দিয়ে যাচ্ছে ভাবনাটা। হঠাৎ একটা সংসার অভিভাবকহীন হয়ে গেলে কী করে চলবে এরপর ! বাড়ির সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকলেও সে জানে, তাদের বাড়ির অবস্থা কী রকম। শিক্ষকতার চাকরি থেকে যে কটা টাকা পেতেন, তাতে সঞ্চয় দূরে থাক, সংসার চালাতেই হিমশিম খেতেন বাবা, সে কথা অনেকবার শুনেছে তারা। ফলে রূপম এখনও কোনও মাসে দুশো, কোনও মাসে তিন-চারশো করে টাকা পাঠিয়েছে যাতে সংসারের একটু সুরাহা হয়। সেই সংসার যে হঠাৎ তার বাবা এভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো ফেলে চলে যাবেন তা ভাবতেও পারছে না তারা। তবু এক একটা ঘটনা এভাবেই তো বাজের মতো ভেঙে পড়ে মাথায়।

রূপমের তরফ থেকে কোনও জবাব না আসায় অরুণিমা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, চুপ করে থেকে তাইই ভাবছ নাকি ? বাবা এই বয়সে ফুর্তি করার জন্য সংসার ফেলে দিয়ে পালাবেন, আর সেই সংসার তোমাকে টানতে হলে আমরা কোথায় যাব ?

অরুণিমা যতই রুদ্রমূর্তি ধারণ করছে, রূপম ততই অসহায়, নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। অরুণিমার ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ নিতান্ত অমূলক নয়। অফিসের পে-বিল থেকে নানারকম ডিডাকশন হয়ে যে টাকাটা রূপমের হাতে আসে, তাতে রীতিমতো ম্যাজিক না জানলে এই বাজারে সংসার চালানো দুরূহ। তার ওপর ফ্ল্যাট কিনতে অফিস, এল আই সি, কো-অপারেটিভ ইত্যাদি থেকে যে তিন লাখ টাকার মতো লোন হয়েছে তার ইনস্টলমেন্ট মেটাতে গত একবছর প্রাণান্ত হচ্ছে তারা। গত দু-তিন মাস ধরে অরুণিমা কেবলই বলে চলেছে যে, তখন রূপমের কথায় কলেজের চাকরিটা দুম করে ছেড়ে দিয়ে কী ভুলই না করেছে। অবশ্য তখন ছেড়ে না দিয়ে উপায়ও ছিল না। রূপমকে তিনবছরের জন্য আগের

কোম্পানির কাজে আমেদাবাদ মিলে জয়েন করতে হল। অত দীর্ঘ ছুটি তাদের কলেজ মঞ্জুর করল না বলেই—

কতক্ষণ ধরে তারা দু'জন এভাবে পার হয়ে যাচ্ছিল দুঃসহ মুহূর্তগুলো তা জানে না। তাদের কেবলই মনে হচ্ছিল এক ভয়ঙ্কর খাদের মুখে এসে পৌঁছেছে তারা। শিবপ্রসন্ন রায় হঠাৎ এভাবে চলে যাওয়ায় একটি সংসারের অর্থনৈতিক সংকট যেমন তীব্র আকার ধারণ করেছে, তার সঙ্গে যে বিপুল লজ্জার বোঝা চেপে বসেছে তাদের উপর তাও এই মুহূর্তে চরম অসহনীয় তাদের প্রাথমিক বিমূঢ় অসহায় ভাব কেটে যাওয়ার পর এখন দু'জনেই পাগলের মতো মাথা খুঁড়ছে কীভাবে এই সমস্যার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

এই প্রবল সংকটের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে অরুণিমার কেবলই মনে হচ্ছিল, হঠাৎ একটা এলোঝড় কোত্থেকে ফুঁড়ে এসে তাদের তিল তিল করে সাজানো ফ্ল্যাট তছনছ করে দিয়ে গেল। অন্যদিন রূপম বাড়ি ফিরতেই সে দ্রুত ছুটে যেত কিচেনে চা করতে, আজ তার তাও মনে ছিল না। টিটো অনেকক্ষণ আগেই গিয়ে সেঁধিয়েছে তার ঘরে, হয়তো বাবা-মায়ের হট-ওয়ারের আগাম প্রস্তুতি অনুমান করে সে তাড়াতাড়ি খুলে বসেছে তার বই খাতা কালকের হোমটাস্ক করে রাখছে, না হলে একটু পরেই তার মায়ের রুদ্রমূর্তির ঝাল এসে আছড়ে পড়বে তার গালে বা পিঠে।

বহুক্ষণ যাবতীয় সম্ভাবনা নাড়াচাড়া করার পর অরুণিমা বলল, তা ওঁর স্কুলে কোন পাওনাগণ্ডা নেই? না কি সেসবও নিয়ে গেছেন যাবার সময়?

রূপম পুনর্বার অসহায় মুখ করল, কিছুই তো বুঝতে পারছি নে। ভাবছি, একবার বহরমপুরে গিয়ে স্কুলে খোঁজখবর নিয়ে আসব কিনা—

—না! অরুণিমা তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ন হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রূপমের ওপর, বেশি আগ বাড়িয়ে খবর নিতে যেতে হবে না। তাহলে হয়তো তোমার গলা ধরে ঝুলে পড়বেন ওঁরা। তুমি যা মানুষ, তখন ফেলতে পারবে না ওঁদের। খোঁজখবর যা নেওয়ার, তোমার

ওই অপদার্থ ভাই শৌভিকই নিক। তুমি একটা চিঠি লিখে দাও, বেশ কড়া করে, যাতে শৌভিক স্কুলে গিয়ে খোঁজ নেয় কোথায় যেতে পারেন উনি। দরকার হলে পুলিশে একটা ডায়েরি করে আসুক। মিসিং স্কোয়াডে জানাক।

—সেসব কি আর এতক্ষণ না করেছে? রূপম নিজের মনে বিড়-বিড় করল, নিশ্চয় সব সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার পর এখন চিঠি পাঠিয়েছে কোনও উপায় না পেয়ে।

—তোমাকে আমি অনেকদিন ধরেই বলছিলাম, ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবো। তুমি তো কোনও দিনই আমার কথায় কোন গুরুত্ব দাও না। এখন বোঝো ঝামেলা কাকে বলে।

রূপম ফের বিড়বিড় করে, কী করে বুঝব, বাবা এরকম সাংঘাতিক একটা ডিসিশন নিয়ে নেবেন শেষ পর্যন্ত! এই বয়সে— ভাবা যায়?

অরুণিমা তীব্র বিদ্রুপের সুরে বলে উঠল, কেন ভাবা যাবে না? যা লক্ষ্মীমন্ত মা তোমার—।

—মা!

—হ্যাঁ তোমার মায়ের জন্যই তো আজ এই অবস্থা। তোমার মা যা একখানা জিনিস তাতে ও বাড়িতে থাকা একটা অসম্ভব ব্যাপার। আমি ক'মাস ছিলাম, সারাক্ষণ এমন টিকটিক করতেন যে মনে হতো, সব ফেলেটেলে রাতের বেলা পালিয়ে যাই কোথাও—

রূপম বিভ্রান্ত হয়ে তাকিয়ে থাকে অরুণিমার মুখের দিকে। তার মা বরাবরই মেজাজি টাইপের মহিলা, সারাক্ষণ দাবিয়ে রাখ-তেন শিবপ্রসন্নকে। শেষ দিকে তাঁদের মধ্যে তেমন সম্পর্ক ছিল না বললেই হয়। তারপরও তো সাত আট বছর হতে চলল, রূপম যাতায়াত ছেড়েই দিয়েছে বলা যায়। এ বেলা গেলে ও বেলাই ফিরে আসার চেষ্টা করে, না হলে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালেই। অরুণিমা টিটো তো তিন-চার বছর হল যায়ইনি। এর মধ্যে শিবপ্রসন্নর সঙ্গে অলকাদেবীর কোন জোড় তো লাগেইনি

বরং আরও খারাপ হয়েছিল সম্পর্ক। বিশেষ করে সেই মহিলার সঙ্গে শিবপ্রসন্নর সম্পর্ক জানাজানি হওয়ার পর খুবই।

অনেকক্ষণ পরে সম্বিত ফিরতে অরুণিমা ছুটল চা করতে। রূপম তার জামা-প্যাণ্ট ছেড়ে উপরঝুপুর স্নান করল বাথরুমে ঢুকে, তবু তার উদ্‌ভ্রান্তি কমল না একচুলও। ধবধবে পাঞ্জাবি পরে স্লিপার গলিয়ে সোফায় চায়ের কাপ হাতে তুলেও সে ফিরে পেল না তার স্বাভাবিকতা। অরুণিমাও চায়ে দু-একবার চুমুক দিয়ে সরিয়ে রাখল চমৎকার ফুল-ফুল নক্‌সা-কাটা কাপটি।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অরুণিমা, কাঁদতে কাঁদতে কেবলই বলতে লাগল, এরপর লোকের কাছে আর মুখ দেখানোই যাবে না।

রূপম তার পিঠে হাত বুলিয়ে, মাথার চুলে বিলি কেটে সান্ত্বনা দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করল অনেকক্ষণ। সেও বুঝতে পারছে, সমস্যাটা কেবল তো অরুণিমার নয়, সে যে সমাজে মেলামেশা করে, খবরটা সে পর্যন্ত পৌঁছুলে, সেখানেও হাসাহাসি, কানাকানি চলবে অফিসে তো রীতিমতো ঝড় উঠবে সেকশনে সেকশনে, টেবিলে টেবিলে।

পরদিন সকাল থেকে মুখ থমথমে করে অরুণিমা ঢুকে গেল কিচেনে। সকালের এই ঘণ্টাদুয়েক সময় তাকে ঝড় তুলতে হয় রূপমের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডাইনিং টেবিলে ভাতের থালা সাজিয়ে দিতে। আজ বোধ হয় কিছুটা লেটই করে ফেলল। রূপম তখনও খাওয়ার অর্ধেক পথও পৌঁছতে পারেনি তার আগেই তার কোম্পানির গাড়ি এসে নীচে গেটের কাছে ছোট্ট আওয়াজ তুলল দুবার, পিঁক, পিঁ—ক। এ আওয়াজটা অরুণিমার চেনা। কোম্পানির গাড়ি।

৩

কাঁটায় কাঁটায় নটা পনেরতে তার সাদা অ্যাম্বাসাডারটি জি. এম সাহেবের ফ্ল্যাটের গেটে এসে পার্ক করিয়েছে সেণ্টু। গাড়ি জায়গামতো রেখে তার রীতি অনুযায়ী দুবার পিঁক পিঁক শব্দে হর্ণ বাজালো। এর পর মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে রোজ। একটু পরেই জেনারেল ম্যানেজার রূপম রায় অ্যাটাচি হাতে নিয়ে নেমে আসবেন হনহন করে। কিন্তু আজ পাঁচমিনিটের জায়গায় দশমিনিট হতেও রায়সাহেব নেমে এলেন না দেখে একটু আশ্চর্য হল সেণ্টু। সাহেবের তো সময়ের নড়চড় হয় না।

প্রায় তিনবছর হল এই সাহেবের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড্‌ হয়েছে সে। এই তিনবছরে তাদের 'দি ওয়ার্ল্ড-ওয়াইড সিল্ক ট্রেডিং কোম্পানির' জেনারেল ম্যানেজার রূপম রায়ের সময়জ্ঞান সম্পর্কে সে টায়েটায়ে ওয়াকিবহাল। অফিসে সকাল সন্ধে যাতায়াতের সময় তো বটেই, দুপুরের দিকে এ অফিসে ও অফিসে ছোটাছুটি —তা ছাড়াও প্রায়ই অফিসের কাজে জেলায় জেলায় ট্যুরের সময়ও সে-ই জি এম সাহেবের সঙ্গি। বিশেষ করে বাইরে ট্যুরে গেলে রূপম বলেন, এখন তুমিই আমার গার্জেন, সেণ্টু। গার্জেন কাম-কেয়ার-টেকার কাম-বডিগার্ড-কাম-পরিত্রাতা। তোমার হাতে স্টিয়ারিং যখন, তুমি বাঁচালে আমি বাঁচব। তুমি মারলে আমি মরব।

নিজের ড্রাইভিঙের ওপর অগাধ বিশ্বাস সেণ্টুর। সে যখন ন্যাশনাল হাইওয়ে কিংবা স্টেট হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চালায় তখন প্রায় রাজার মতোই ড্রাইভ করে। স্পিডোমিটারের কাঁটা সত্তর আশির ভেতর দুলতে থাকে ক্রমান্বয়ে। রাস্তা ভাল থাকলে নব্বইয়ে ছুঁইয়ে দেয় কাঁটা। দৈত্যের মতো ছুটে আসা ট্রাকগুলোও তাকে সমঝে চলে।

ভাবতে ভাবতে সেণ্টু আজ আশ্চর্য হয়ে তাকাল তিন-তলার ব্যালকনির দিকে। বেশ দেরিই হয়ে যাচ্ছে, অথচ আজ এখনও জি এম সাহেব নামছেন না কেন নীচে! অসুখ-বিসুখ করেনি তো!

গত সাতদিন সেণ্টু তার সাহেবের ডিউটিতে আসতে পারেনি। হঠাৎই তার গাড়ির অসুখ হওয়াতে এই কদিন গ্যারেজে বসে ডবলিউ এন ডবলিউ থ্রি জিরো ডবল সেভেনের মেরামতি দেখভাল করার ফাঁকেও সে খবর রেখেছে জি. এম সাহেবের।

উনিও বারবার সেণ্টুর খবর নিয়েছেন, গাড়ি কদ্দুর? গাড়ির অসুখ হলে সেণ্টুও ভাবনায় থাকে। গাড়িটা প্রায় তার ছেলের মতো। গাড়ি অন-রোড থাকলে তবেই না তার শান্তি। জি. এম সাহেবেরও তাই। তাই গাড়ি রেডি হতেই সে ঠিক সময়মতো এসে পেঁছেছে এখানে। কিন্তু সাহেবই আজ লেট। লেট মানে জব্বর লেট।

গত তিন বছরের অভিজ্ঞতায় সে জানে, প্রতিদিন ঠিক নটা-কুড়ির মধ্যে রূপম রায় গাড়িতে উঠবেন। নিখুঁতভাবে গাড়ি চালিয়ে সেণ্টু নটা পঞ্চাশ পঞ্চান্ন মধ্যে পেঁছে যায় ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে। সাহেব বেরুতে দেরি করা মানে ওদিকে অফিসে পেঁছতেও দেরি হয়ে যাওয়া—যা ওঁর একেবারেই না-পছন্দ। তাহলে আজ নিশ্চয় কোনও গড়বড়।

সেণ্টু যখন উপরে উঠে খোঁজ নেব কি নেব না এমন ভাবছে, ঠিক সেই সময় অ্যাটাচি হাতে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলেন জি এম সাহেব। খুবই চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে। অন্যদিনকার চেয়ে ঢের বেশি গম্ভীর। একটু বিষণ্ণও যেন। খুব বেশি ভাবনায় থাকলে সাহেবের কপালে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ে। আজও তেমনি ভাঁজের পর ভাঁজ। গাড়ির কাছে এসে অ্যাটাচিটা ভেতরে ছুড়ে দিয়ে দ্রুত ঢুকতে ঢুকতে বললেন, একটু জোরে চালিও, সেণ্টু।

বাঁই করে গাড়ি ঘুরিয়ে সেণ্টু তৎক্ষণাৎ নেমে এল বড় রাস্তায়।

সাহেব একবার হুকুম দিলে সে কলকাতার ভিড়াভিড়াককার পথেও কেউ প্লেনের মতো উড়ে যেতে পারে। তার হাতের স্টিয়ারিং, দু'পায়ের নীচে অ্যাকসিলেটর, ক্লাচ, ব্রেক তার সঙ্গে কথা বলে সারাক্ষণ। গাড়ির প্রত্যেকটা পার্টস এই মুহূর্তে তার আজ্ঞাবহ। যখন যাকে হুকুম দিচ্ছে, সে-ই কুর্ণিস জানাচ্ছে তার কাছে মাথা নত করে। আলিপুর জর্জকোর্টের পাশের রাস্তা দিয়েই সে রোজ বেরিয়ে আসে। ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাশ দিয়ে ডাইনে তাজ বেঙ্গল বাঁয়ে চিড়িয়াখানা ফেলে পেঁছিয় রেসকোর্সের মুখে। এই রাস্তাটা মোটামুটি ফাঁকাই থাকে, গাড়ি চালিয়ে খুবই আরাম। তারপর রবীন্দ্রসদনের ক্রশিঙে যা দু-একদিন দেরি হয়। তাও আর কতক্ষণ।

আজও তেমনই হু হু করে গাড়ি চালাতে চালাতে সেন্টু হঠাৎ বলল, স্যার, আসার সময় এম. ডি-এর গাড়িটা আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। একবালপুরের দিকে বাঁক নিল গাড়িটা।

জি. এম. অন্যমনস্ক ছিলেন বোধহয়। সম্বিত ফিরে পেয়ে আশ্চর্য হলেন, তাই নাকি!

আশ্চর্য হওয়ারই কথা, কারণ তাদের এম. ডি. থাকেন সল্ট-লেকে। রোজই পার্ক সার্কাস কানেকটর দিয়ে এসে ঢুকে পড়েন তাদের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে। সকালের এই অফিস আওয়ারে তাঁর এখন একবালপুরের দিকে যাওয়ার কী দরকার পড়ল তা বুঝে ওঠা গেল না।

একটু থেমে সেন্টু আবার বলল, সঙ্গে একজন মেয়েছেলে আছে স্যার।

মেয়েছেলে! জি. এম. সাহেব এবার যে বেশ সচকিত হয়ে উঠ-লেন, তা স্টিয়ারিঙে হাত রেখে সামনের আয়নায় স্পষ্ট বুঝতে পারল সেন্টু। বুঝে ফেলেই সে পরিবেশন করল সংবাদের পরবর্তী অংশটুকু, মেয়েছেলেটা প্রায়ই এসে এম. ডি সাহেবের চেম্বারের সামনে বসে থাকে দেখেছি। কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। বেশ লম্বা।

এম. ডি.-র চেম্বারের সামনে এমন দৃশ্য হামেশাই দেখা যায় বটে, কিন্তু যে মেয়েটির কথা সেন্টু বলছে সে ঠিক কে, তা বোঝার

চেষ্টা করল রূপম। বর্ণনা শুনে হঠাৎ একঝলক মনে হল, হয়তো কারুবাকী মিত্রই হবে বা। মেয়েটা এম ডি.-র ফাঁদে পা দিয়েছে, এখন তাকে নিয়ে কদ্দুর যাবেন এম. ডি. তা কে জানে। কিন্তু তাকে নিয়ে একবালপুরের দিকে কেন! অবশ্য এম. ডি.-র গাড়িতে আরও অনেক মেয়েছেলেকেই যে দেখা যায় তা এখন তাদের কোম্পানির প্রায় সবাইই জেনে গেছে।

পেছন থেকে রূপম রায়ের গলা শুনতে পেল সেন্টু, তা গাড়ি চালাতে চালাতে এমন নিখুঁত ভাবে গাড়ির ভেতরটা দেখলে কী করে, সেন্টু! তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তো দারুণ। কিন্তু অন্য দিকে এত চোখ দিলে গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট না হয়ে যায় কোনদিন।

সেন্টু হাসল, স্যার, হাতে স্টিয়ারিং পায়ে ব্রেক থাকলে কোনও অঘটন যে ঘটবে না সে ব্যাপারে চিন্তিত থাকতে পারেন, তবে অদৃষ্টের কথা বলতে পারিনে। অন্য গাড়ি যদি গুড় গুড় করে আমার গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আসলে এম. ডি.-র গাড়িটা দেখলাম বলেই চট্ করে একনজর দেখে নিলাম ভেতরটা।

—বেশ করেছ। জি. এম. সাহেবের গলা শোনা গেল ফের, তা এসব গল্প আবার এর ওর কাছে বলার দরকার নেই। বুঝলে!

সেন্টুর ঠোঁটের ডগায় একচিলতে হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল, না, স্যার, শুধু আপনার কাছেই বললাম। কোম্পানির আর সব ড্রাইভারদের অব্যেশ, অফ্ টাইমে সাহেবেরা কে কী করেন তাই নিয়ে খোসগল্প করা। বিশেষ করে, এম. ডি. সাহেবকে নিয়ে তো খুবই হাসাহাসি করে ওরা। ওনার ড্রাইভার তো সবার কাছে বলে বেড়ায়, কখনও ওর সাহেব কোন হোটেলে গেছেন, সঙ্গে কোন্ মেয়েছেলে ছিল, কোনদিন বেসামাল হয়ে ফিরলেন, কবে এমন আউট হয়ে গিয়েছিলেন যে শেষে পাঁজাকোলা করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসতে হয়েছিল বাড়িতে।

জি. এম. সাহেব আঁতকে উঠলেন, বাহ্ বেশ আছ তোমরা। তা আমাকে নিয়েও এরকম আলোচনা করো নাকি?

সেন্টু একহাত জিব কেটে বলল, কী যে বলেন স্যার। অপনার মতো মানুষ কি এই কোম্পানিতে আছে? ওরা তো স্যার ই. এম.

সাহেবকে নিয়েও হাসাহাসি করে। আজকাল নাকি প্রায়ই ড্রিংক করে বাড়ি ফিরছেন। এতকাল কিন্তু ওঁর এই দোষ ছিল না। সেন্টু একটু পেছন ফিরে তাকাল। তবে, আপনার নামে কেউ অপবাদ দিতে পারে না। আমাকে মাঝেমধ্যে ওরা খোঁচায় বল্ না তোর সাহেব কী করে? তা আমি কি বলি জানেন?

—কী?

—বলি যে, আমার সাহেব হলেন দেবতুল্য মানুষ। সবসময় মাথা উঁচু করে চলেন। আর চলবেন নাই বা কেন। কত বড় বংশে ওর জন্ম। ওনার বাবা নামকরা স্কুলের টিচার। এখন-কার ছেলে ছোকরারা না হয় টিচারদের সম্মান দেয় না, কিন্তু আমরা তো ছোটবেলায় দেখেছি, টিচাররা কত সম্মানীয় ব্যক্তি, কত নির্লোভ হন ওনারা। এখনও আমার কোনও টিচারের সঙ্গে দেখা হলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। তা টিচারের ছেলে বলেই তো আমাদের জি. এম. সাহেব এমন দেবতুল্য মানুষ—

শেষ কথাগুলো রূপমের কানে হঠাৎ তীরের মতো বিঁধে গেল যেন। সেটা অবশ্য সেন্টুর বোঝার কথা নয়। তার বাহন তত-ক্ষণে এসে পৌঁছেছে রেসকোর্সের মুখে, কী কারণে যেন আজ এখানে সামান্য জ্যামজট, গাড়ি থামিয়ে বলল, স্যার চাকরি তো আর কম দিন হল না, আরও তিন চার জায়গায় ঠিক যেতে যেতে এখন এসে থিতু হয়েছি এই কোম্পানিতে। আরও কত কত অফিসারের সঙ্গে কাজ করেছি। তার কতরকম যে অভিজ্ঞতা তাতে একটা কথা শিখেছি যে, ড্রাইভার কখনও তার বস্ সম্পর্কে কোথাও মুখ খুলবে না। ভাল ড্রাইভারের সেইটেই কেতা। বলতে বলতে সেন্টু হঠাৎ হাসল, স্যার, কথাটা অবশ্য আমাকে বলেছিলেন, একেবারে প্রথম যেখানে চাকরি পাই, সেই গাড়ির মালকান্—

—মাল্কান! জি. এম. সাহেবকে বোধহয় একটু উৎসুক মনে হয় সেন্টুর।

—হ্যাঁ স্যার। তখন ড্রাইভারের লাইসেন্স পেয়ে এখানে ওখানে ছোটাছুটি করছি চাকরির জন্য। তার আগে কয়েকদিনের জন্য হোমগার্ডের চাকরি পেয়েছিলাম। সে সময় পুলিশের এক

বড় অফিসারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ডি আই. জি র‍্যাঙ্কের অফিসার। তাঁকে রোজ বলতাম, স্যার, হোমগার্ড না হোক, অন্তত একটা ড্রাইভারের চাকরিও যদি কোথাও জোগাড় করে দেন। তা মাস দুই পরে তিনিই পাঠালেন এক মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিঙের বারোতলায়। গাড়ির মালিকান ফ্লাটে একা থাকেন, তাঁরই গাড়ি চালাতে হবে। মালিকানের বয়স বেশি নয় স্যার, তেইশ-চব্বিশ হবে, খুব ফ্যাসান-দুরস্ত চেহারা। দেখতেও বেশ সুন্দর। ওপর তলায় একা থাকেন আলদা ফ্ল্যাট নিয়ে। আর তার বাবা-মা ভাই থাকেন ওই বাড়িরই দোতলায়, আর একটা ফ্লাটে। তা মালকানের সঙ্গে কথা বলে বেশ ভালই লাগল প্রথমটা। প্রথমদিন গাড়িতে উঠেই বললেন দ্যাখো সেন্টু গাড়ির ড্রাইভার হবে রোবটের মতো। তার কাজ শুধু গাড়ি চালানো, ব্যাস। আমার গাড়িতে কে উঠছে না উঠছে, কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি, কখন বাড়িতে ফিরছি, কাব সঙ্গে ফিরছি, এসব তার জানার কথা নয়, আগ্রহও থাকার কথা নয়। আমার বাড়ির লোকও তা কখনও জানবে না, তোমাকে জিজ্ঞাসা করলেও হাঁদার মতো মুখ করে তাকিয়ে থাকবে। যেন কিছুই জানো না, কিংবা মনে নেই। তা স্যার, ভাবলাম বড়লোকেব বাড়ির মেয়ে, হয়তো এটাই কেতা। প্রথমদিন বিকেলে বেরিয়ে এখানে ওখানে দু-তিন বার ঢুঁ দিলেন, তারপর সঙ্গে জোটালেন মুশকো চেহারার একজন বয়স্ক লোককে। তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন পার্ক স্ট্রিটে একটা দোকানে। দোকানটা দেখেই বুঝলাম, এটা বার। গাড়ি থেকে নেমে বললেন, এখানেই থাকবে, যতক্ষণ না ফিরি। তখন সবে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আমি স্টিয়ারিঙের সামনে বসে আছি, ভাবছি এই ফিরলেন বলে। তারপর বসে আছি তো আছিই, রাত আটটা বাজল। ন'টা বাজল, দশটা বাজল, আমি ভাবলাম কী হল, মালিকান কি আমাকে ভুলে গেলেন নাকি! অন্য কারও সঙ্গে বাড়ি চলে গেলেন! কিন্তু আমাকে হুকুম দিয়ে গেছেন তিনি না আসা পর্য্যন্ত যেন ঠায় বসে থাকি। তারপর রাত এগারটা বাজল বারোটাও। আমার তখন খিদেতে পেট চুঁই-চুঁই করছে। এদিকে গাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে পারছি নে।

বসেই আছি, মনে ভাবনা হচ্ছে কী জানি কোনও বিপদ আপদ হল কি না।

—তারপর! জি. এম. সাহেবও তখন উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন, ফিরলেন শেষ পর্য্যন্ত?

—ফিরলেন, তখন রাত পৌনে একটা কিন্তু মালকানের দশা দেখে তখন আমার আক্কেল গুড়ুম। তিনি তখন নেশায় বেহুঁশ। তাঁকে কোনোও ক্রমে ধরাধরি করে সেই মুশকো চেহারার লোকটা বসিয়েছিলেন পেছনের সিটে, তার পাশে নিজেও এসে বসলেন। তারপর যেখান থেকে উঠেছিলেন একটু পরেই নেমে গেলেন সেখানে। নামার সময় জড়ানো গলায় বললেন, ওকে ঠিকঠাক ফ্ল্যাটে পেঁছে দিও, আমি তো তখন ঘোর বিপদের মধ্যে। ভাল করে আলাপও হয়নি মালকানের সঙ্গে। অথচ তিনি তখন বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন সিটের ওপর। ফ্ল্যাটের সামনে গাড়ি রেখে দেখি, উঠে হেঁটে যাবার মতো অবস্থাও নেই। এদিকে তখন কলকাতায় মাঝরাত। চৌরঙ্গি রোডের ওপরও তেমন মানুষজন নেই। দোতলায় ওনার বাবা-মাকে যে খবর দেব তারও উপায় নেই, তাহলে মালকান রেগে যাবেন। আরও সমস্যাটা হল সিঁড়ির পাশে গিয়ে দেখি লিফ্‌ট্ বন্ধ।

—স্ট্রেঞ্জ! জি. এম. সাহেবের গলা শুনতে পেল সেন্টু।

—তারপর স্যার গাড়ি থেকে প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম মালকানকে। সিঁড়ি বেয়ে ওই সোমত্ত বয়সের মেয়েকে নিয়ে কোনও ক্রমে উঠে এলাম বারোতলায়। মালকান তখন জড়ানো গলায় বললেন, তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগে চাবি আছে। আমি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দেখি, স্যার, তার ভেতর তাড়া-তাড়া নোট। চোখ বন্ধ করে কোনরকমে চাবিটা বার করে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম মালকানকে, তারপর দরজার বাইরে এসে ভেজিয়ে দিতেই দরজা অমনি-অমনি বন্ধ হয়ে গেল। এসব দরজা বাইরে থেকে ঠেললেও তখন খোলা যাবে না। নীচে এসে গাড়ি গ্যারেজ করে হেঁটে হেঁটে ফিরলাম বাড়িতে। তখন রীতিমতো বুক কাঁপছে আমার। এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। তবু ভাবলাম যাগ গে, বড়লোকের বাড়ির ব্যাপার অমন

একটু-আধটু হয়েই থাকে। পরদিন ডিউটিতে গিয়ে দেখি, মালকানের আগের রাতের কথা তেমন মনে নেই। শুধু বললেন, বিকেলে বেরুবেন। বিকেলে বেরোনোর কথা শুনেই আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আগে ভেবেছিলাম, হয় তো ওটা একদিনের ব্যাপার। কিন্তু পরদিনও যখন দেখলাম, উনি আবার সেই বাবের সামনে গিয়ে নামলেন, আর সঙ্গে অন্য একজন জবরদস্ত চেহারাব লোক—

– মাই গড্! জি. এম. সাহেবকে বেশ আশ্চর্য্য মনে হল এবাব

—পরের দিনও তাঁদের বেরুতে রাত একটা হয়ে গেল। আব সেদিনও মালকানকে আগের দিনের মতোই পাঁজকোলা করে তুলে দিয়ে আসতে হল তাঁব ফ্ল্যাটে।

—এ কাজ তুমি কদ্দিন করছিলে, সেন্টু ?

—তারপর চারদিন যখন একইভাবে রাত সাড়ে বাবোটা-একটায় ফিরতে হল, আমি তার পরের দিন ভোর হতেই সেই পুলিশ অফিসারের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। বললাম, এ চাকরি করা আমার পোষাবে না স্যার। আজ থেকে আর ডিউটি করতে যাব না।

—চাকরিটা ছেড়ে দিলে, সেন্টু ?

—দিলাম স্যার, তখন আমার কাঁচবয়স। কুড়ি একুশ বছর মোটে। রোজ ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর তাড়া-তাড়া টাকা, আর পাঁজকোলা করে ভরা বয়সের মেয়েছেলেকে বারোতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠে তার ঘরে শুইয়ে দিয়ে আসা—চারদিন পরেই মনে হল চরিত্র ঠিক বাখতে পারব না। একা ঘরের ভেতর মালকানকে অমন বেসামাল অবস্থায় দেখে মাথা ঠিক রাখাই মুশকিল ছিল, স্যার। তারপর কোন কেসে জড়িয়ে পড়তাম তার ঠিক কী—

বলতে বলতে ততক্ষণে জ্যামজট ছাড়িয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে পেঁছে গেছে তারা। আজ একটু লেটই হয়ে গেছে জি এম. সাহেবের। বাড়িতে তখন দশটা বেজে পাঁচ। গাড়ি থেকে প্রায় লাফিয়ে নেমে দৌড়তে লাগলেন। লেটে অফিসে ঢোকা একদম পছন্দ করেন না সাহেব। কিন্তু সেন্টু কীই বা করবে আর। সাহেবই তো

ঘর থেকে বেরোলেন দেরি করে। আশ্বস্ত হল এই ভেবে যে, তার গল্প শুনতে জি. এম. সাহেবের ভুরুর কোঁচ সিধে হয়ে গিয়েছিল। তার জীবনের প্রথম চাকরির গল্প এতদিন পর সেন্টু নিজেও উপভোগ করছিল বেশ। সেই গল্পে তার সাহেব যে টেনশন কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন সেটাও কম নয়। আসলে সাহেবরা বড্ড টেনশনে ভোগেন সারাক্ষণ টেনশন আর টেনশন। মাঝমধ্যে তাকে বলেন বুঝলে সেন্টু, প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি করি, প্রতিদিনই অফিসে আসার সময় মনে হয় গিয়ে শুনব আমার চাকরি নেই। সেন্টু অবশ্য সে-কথায় হাসে, স্যার, চাকরি গেলে চাকরি আবার হবে। কত লেখাপড়া জানেন আপনারা। আমরা মুখ্যুসুখ্যু লোক। এই নিয়ে পাঁচটা অফিসে চাকরি করা হল। তাতে জি. এম. সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, বুঝলে সেন্টু বোধহয় গাড়ি চালানোটা ভাল করে শিখে নিলেও অনেক নিরাপদে থাকতাম। চাকরি গেলে অন্তত গাড়ি চালিয়েও যেতে পারতাম এমন মনে হয় মাঝে-মাঝে।

জি. এম সাহেবের কথা শুনে বেশ মজা লাগে সেন্টুর।

সেদিন অফিস থেকে সাহেব বেরুলেন একটু ভাল মেজাজেই। দুপুরে খবর পেয়েছিল সেন্টু, জি এম. সাহেব কোথায় যেন যাচ্ছেন অফিসের কাজে। ট্যুরে যেতে খুব পছন্দ করেন উনি। বোধহয় তাইই মেজাজটা একটু প্রসন্ন। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ক্যামাক স্ট্রিট থেকে বেরুতে বেরুতে সেই কথাই পাড়ল সেন্টু, স্যার, কোথায় যেন ট্যুরে যাচ্ছেন শুনলাম বোম্বে না গোয়ায়—

জি. এম, সাহেব অবাক হলেন, সে খবর তুমি জানলে কী করে?

এম, ডি-সাহেবের ড্রাইভার রতন বলছিল। সকালে কে যেন ওঁর গাড়িতে উঠেছিলেন, তাকে নাকি বলেছেন আমাদের জি, এম, খুব ভালো অফিসার ওঁকে পাঠানো হচ্ছে সেমিনারে।

জি, এম, আশ্চর্য হয়ে বললেন, তাই নাকি!

—হ্যাঁ স্যার। রতন বলছিল, ওর সাহেব নাকি কারুর প্রশংসা করেন না। ও ত খুব অবাক হয়ে গিয়েছে।

—আমিও তো অবাক হচ্ছি সেন্টু। কারণ এম, ডি-র সঙ্গে

অনেক ব্যাপারেই আমি একমত হতে পারছি না। আজকেও দু-তিনটে ফাইলে এম, ডি যা চাইছেন তার উল্টো নোট লিখে পাঠাতে হল—, বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন রূপম রায়। হয়তো ড্রাইভারের সঙ্গে এত সব কথা আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না এই ভেবে। কিন্তু সেন্টুর সঙ্গে তার সাহেবের একটা অন্যরকম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ক'বছরে।

সেন্টুও হেসে তাই মনে করিয়ে দিল, তাহলে স্যার একটু সাবধানে থাকবেন। আমি শুনেছি এম, ডি, মুখে যা বলেন, কাজের সময় ঠিক তার উল্টোটি করেন। ক'দিন আগেই একসপোর্ট ডিভিশনের অ্যাসিট্যান্ট ম্যানেজার জিৎ মুখার্জী বিয়ের জন্য ছুটি চেয়েছিল একমাস। কুলু-মানালিতে যাবে হনি-মুন করতে। এম. ডি-কে বলতেই উনি নাকি বলেছিলেন, বাহ্ ফাইন। ফাল্গুনে কুলু-মানালি দারুণ লাগবে। মুখার্জীবাবু তো আনন্দে ডগোমগো। কিন্তু স্যার, ছুটির দরখাস্ত পেতে তার উপর নোট দিয়েছেন, এখন কোম্পানীতে প্রচুর কাজ জমে গিয়েছে। সাতদিনের বেশী ছুটি দেওয়া যাচ্ছে না। অথচ জিৎ মুখার্জী এম, ডি-কে ট্রেনের রিজার্ভেশন করা টিকিটও দেখিয়েছিলেন এম, ডি-কে।

রূপম রায় হাসলেন, আমিও অবশ্য গোয়ায় যাওয়ার ব্যাপারটা তত গুরুত্ব দিয়নি। তারপর আজ এম, ডি, হঠাৎ প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে দিতে অবাক হয়েছি খুব। শেষ পর্যন্ত সত্যিই এম, ডি আমাকে পাঠালেন দেখে ঘটনাটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

—প্লেনে করে যাচ্ছেন, স্যার।

—হ্যাঁ, টিকিট দেখে তাইই তো মনে হচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সেন্টু বলল, ওখানে ট্রেনে যাওয়া যায় না স্যার।

রূপম রায় আশ্চর্য হলেন, কেন?

—প্লেনে চড়ার ব্যাপারে মনটা সবসময়ই কেন যেন ভীষণ খুঁত-খুঁত করে।

জি, এম, সাহেব হেসে উঠলেন হা হা করে, ধুর। প্লেনে উঠলেই কি প্লেন ভেঙে পড়ে নাকি। সারা পৃথিবীতে মিনিটে মিনিটে

কলকাতার বাস-ট্রেনের মতোই কত প্লেন যাতায়াত করছে তার খবর রাখো ? সেগুলো সব কি ভেঙে পড়ে নাকি ?

—না স্যার, আসলে মাঝেমধ্যে খবরের কাগজে ছবি বেরোয় তো—

—ধুস্ ! শোনো সেন্টু তুমি কি জানো, যত প্লেন সারাবছরে ভেঙে পড়ে, তার অনেকগুণ বেশি অ্যাকসিডেন্ট হয় গাড়িতে। গাড়ির তুলনায় প্লেন-দুর্ঘটনার সংখ্যা শতকরা হিসেবে খুবই সামান্য।

অতএব তোমাকে অত দুশ্চিন্তা করতে হবে না আমার জন্য। ফিরে এসে তোমার গাড়িতে আবার ঠিক যাতায়াত করব, বুঝলে ? একটু থেমে রূপম রায় আবার বললেন, আসলে কি জানো সেন্টু ! আমার মনে হয় মানুষ তার পায়ের নীচে যতক্ষণ মাটি খুঁজে পায়, ততক্ষণ নিরাপত্তা বোধ করে। প্লেনে উঠলে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়, তেমনি লঞ্চ, স্টিমার কিংবা জাহাজে উঠলেও পায়ের নীচে জল দেখলে তার ভেতরে একটা ভয়ের বোধ কাজ করে। ভয়ের জন্ম সেখান থেকেই—

—কবে যাচ্ছেন স্যার ?

—সে এখনও দেরি আছে। তার আগে কাল ভোরে উঠেই আমাকে অন্য জায়গায় ছুটতে হচ্ছে।
আলিপুর রোড পার হয়ে সেন্টুর গাড়ি ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে চেতলার রাস্তায়।

—কাল ভোরের ট্রেনে, ইস্পাত এক্সপ্রেসে জামসেদপুর যেতে হবে। ভোর পাঁচটা পঞ্চান্নয় ট্রেন। পৌনে পাঁচটায় আমার ফ্ল্যাটে এসে গাড়ি লাগাবে, বুঝলে ?

৪

টানা দু'দিন জামসেদপুরের এক দঁদে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে সন্ধের দিকে আবার ইস্পাত এক্সপ্রেস ধরল রূপম। গতকাল ভোরে ইস্পাতেই এসেছিল, তারপর দুটো দিন কপালে তিলক-কাটা সেই বজরংলালের পাল্লায় পড়ে তার ব্যবসায়িক বুদ্ধি আরও বেড়ে গেল। লোকটার বয়স খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ, কিন্তু ঘন ঘন আমেরিকা-কানাডা ঘুরে, উধারকা মাল ইধার, ইধারকা মাল উধার করে এর মধ্যে কোটিপতি বললেও কম বলা হবে। তবু যা হোক তাকে কনভিন্সড্ করাতে পেরেছে রূপম। লোকটা টোপ গিললে কয়েকলক্ষ টাকার সিল্ক অনায়াসেই বছর-বছর এক্সপোর্ট করতে পারবে 'দি ওয়াল্ড ওয়াইড সিল্ক এক্সপোর্ট কোম্পানি।'

পরশু তাদের কোম্পানির চেয়ারম্যান সীতাপতি চোপরা তাকে ডেকে বলেছিলেন, বজরংলাল মারফত এক্সপোর্ট করতে পারলে দু'দুটো সুবিধে। এক, ধারবাকিতে কোনও কারবার করে না লোকটা। সব পেমেন্টই নগদে। দুই, বিক্রির চ্যানেল একই সঙ্গে আমেরিকা আর কানাডায় হবে, এটা কম কথা নয়।

বজরংলালকে বেশ ভাল করে পটিয়ে খানিকটা প্রসন্নমনেই ট্রেনে তার নিজস্ব ক্যুপটিতে ঢুকেছিল রূপম। ফার্স্টক্লাসের বগিটি আজ আশ্চর্যজনকভাবে ফাঁকা। ওঠার আগে চার্ট দেখে নিয়েছে, যে ক্যুপটিতে সে বার্থ পেয়েছে তার যাত্রী সে একাই। কাল ভোরে ট্রেনে ওঠার আগে অ্যালিস্টার ম্যাক্লিনের একটা থ্রিলার কিনেছিল হুইলারের স্টল থেকে. তার অর্ধেকটা শেষ করে ফেলেছে, বাকি অর্ধেক আজই শেষ করবে এমন ভাবতে দরজা টেনে সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যেতেই হঠাৎ চমকে উঠল। অন্য সব ক্যুপে লাইট জ্বালা থাকলেও এই ক্যুপটির ভিতর আলো নেই। বাইরের আলোতে

ভেতরে সামান্য আলো-আঁধারি। সেই আলোয় ভেতরকার দৃশ্য দেখে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

ট্রেনটা আসছে সেই রাউরকেল্লা থেকে। ভেতরে কোন যাত্রী থাকার কথা নয় তবু কেউ একজন শুয়ে আছে নিচের সিটে, কোন মহিলাই, নড়াচড়া করছে না বলে প্রথমটা মনে হয়েছিল বুঝিবা ঘুমিয়েই আছেন। কিন্তু তার শোয়ার ভঙ্গি আর নিষ্পন্দ শরীর দেখে মনে হল কোন গোলমেলে ব্যাপার। মহিলার একটা পা ঝুলছে সিট থেকে। শাড়ির একটা অংশ গড়িয়ে আছে ক্যুপের মেঝেয়।

ঘাবড়ে গিয়ে রূপম তৎক্ষণাৎ খুঁজে পেতে ক্যুপের ভেতরকার আলো জ্বালাতে চাইল। খুঁজতে দেরিই হল কিছুক্ষণ। সুইচ টিপতেই যে দৃশ্য নজরে পড়ল তাতে তার চিৎকার করে ওঠারই কথা। তবু সামলে নিয়ে দেখে, সিটের উপর সংজ্ঞাহীন হয়ে শুয়ে আছে এক তরুণী। পরনের শাড়ি-জামা বিস্রস্ত। রক্তও লেগে আছে পোযাকের এখানে-ওখানে। একটু আগেই যে তার ওপর দিয়ে প্রবল একটা ঝড় বয়ে গেছে তা স্পষ্ট হল মুহূর্তে।

অর্থাৎ মেয়েটি ধর্ষিতা। একটু খেয়াল করতেই বোঝা গেল অবিবাহিতা। কীভাবে তার এই দশা হল, কতক্ষণ ধরে সে এই ক্যুপের ভেতর অচেতন হয়ে পড়ে আছে তা কিছু বোধগম্য হল না। রাউরকেল্লা থেকে ইস্পাত এক্সপ্রেস ছাড়ে বেলা আড়াইটে পৌনে তিনটে নাগাদ। এখন সোয়া ছটা বাজে। সম্ভবত ঘটনাটা ঘটেছে এই সময়ের মধ্যেই এবং বহুক্ষণ ধরে। গণধর্ষণও অসম্ভব নয়। একমাত্র টি টি-ই হয়তো হদিশ দিতে পারেন মেয়েটি কীভাবে এই ক্যুপে এল, কিংবা কোন কুপে উঠেছিল কি না। কার সঙ্গেই বা উঠেছিল। এই ক্যুপটি এতক্ষণ ফাঁকা ছিল বলেই ঘটনাটা ঘটতে পেরেছে এই দীর্ঘ সময় ধরে।

ততক্ষণে হুইশল বাজিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করেছে। বগি দুলে উঠতেই রূপমের মনে হল, ঘটনাটা এক্ষুণি টি টি-কে জানানো দরকার।

রূপম কান করে দেখল, দু-চার জনের টুকরো-টুকরো কথা

ভেসে আসছে কোনও কোনও ক্যুপ থেকে। সব ক্যুপের দরজাই বন্ধ। তারাও কেউ জানতে পারেনি ব্যাপারটা।

সেই মুহূর্তে তার মনে হল, এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে, হতভম্ব হয়ে না থেকে মেয়েটির চিকিৎসার কথাই ভাবা দরকার ছিল তার। কারণ মেয়েটি এখনও বেঁচে। তার ভারি বুক নিঃশ্বাসের তালে তালে উঠছে নামছে। তার উচিত ছিল, ট্রেন থেমে থাকতে থাকতেই সবাইকে ব্যাপারটা জানানো, তাহলে মেয়েটিকে এতক্ষণে কোনও হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে ভর্তি করা যেত।

ভাবতে ভাবতে সে দ্রুত চলে গেল ক্যুপের সেই প্রান্তে, যেখানে টি টি সাহেব কালো কোটে বেশ জবরদস্ত হয়ে বসে তাঁর হাতের তালিকাটি দেখছিলেন একমনে। প্রচুর সিট খালি। অথচ একজন প্রার্থীও ঘুরঘুর করছে না তাঁর পিছু পিছু। এহেন ঘটনায় তিনি বোধহয় বিস্মিত, মর্মাহত। তাঁর কাছে গিয়ে রূপম উত্তেজিতভাবে জানাল ঘটনাটা। টি টি ভদ্রলোক মধ্যবয়সী, রূপমের কথা শুনে আঁতকে উঠে বললেন 'এ আবার কী উটকো ঝামেলা!'

উটকো ঝামেলাটির বিবরণ দ্রুত চাউর হয়ে গেল ফার্স্টক্লাসের অন্য ক্যুপের আরও চার-পাঁচ জন যাত্রীর কানে। তাঁরা সবাই রাউরকেল্লা থেকে আসছেন। কেউ কোনরকম চিৎকার-চেঁচামেচিও শুনতে পাননি। মেয়েটিকে উঠতেও দেখেননি কেউ। টি টি-ও তাঁর হাতের তালিকাটা আর একবার পরখ করে বললেন, রাউরকেল্লা থেকে এই মেয়েটি বা অন্য কোনও লোকের ওঠার কথা নয়। মাঝখানে চক্রধরপুরে গাড়ি থেমেছিল একবার। সে সময় তিনি ওদিকের দরজায় ছিলেন। খালি বগি বলে তিনি আর খেয়াল করে দেখেননি। এদিকের দরজা দিয়ে কেউ উঠে ছিল বা নেমে গিয়েছিল কি না সেসময়।

সে যাই হোক, এই মুহূর্তে যে সমস্যার সঙ্গে তারা জড়িয়ে পড়ছে তা রীতিমতো জটিল। মেয়েটির আঘাত কতখানি গুরুতর, তা বোঝা যাচ্ছে না। শুধু যা উপলব্ধিতে এল তাব, মেয়েটিকে কোনও হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

তৎক্ষণাৎ টি টি-কে বলল, 'দেখুন তো. সামনের স্টেশন আসতে আর কত দেরি ?'

টি টি ঘাড় নেড়ে বললেন, সামনেই ঘাটশীলা। কিন্তু সেখানে কি আর ভাল চিকিৎসা হবে। তারপর সেই ঝাড়গ্রাম।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'গাড়িটা যখন থেমে ছিল, তখন বলতে পারেননি ? এখন কী ঝামেলা পাকিয়ে ফেললেন।'

সমস্ত ব্যাপারটা একটু দেরিতে বোঝায় ব্লান্ডার যে একটা হয়েই গেছে তা বুঝতে পেরেছিল রূপম। কিন্তু অফেন্স ইন দ্য বেস্ট ওয়ে অফ ডিফেন্স এই প্রবাদ বাক্যটি স্মরণে রেখে সেও কন্ঠস্বরে ঝাঁঝ মেশালো, 'বাহ্, আপনারা ট্রেনের কামরায় থেকেও এত বড় একটা ঘটনা ঠেকাতে পারলেন না, আর এখন আমাকে দোষারোপ করছেন ?'

টি টি ভদ্রলোক তাতে একটু ঘাবড়ে গেলেন. 'আরে, কোন ক্যুপের ভিতর দরজা বন্ধ করে কী হচ্ছে, তা কি আমার পক্ষে দেখা সম্ভব। যখন রাউরকেল্লা থেকে ট্রেন ছেড়ে ছিল, তখন সব ক্যুপ ঘুরে দেখে নিয়েছি। সবই প্রায় ফাঁকা ক্যুপ। কী করে মেয়েটা কোত্থেকে উঠল, কার সঙ্গে—।'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে রূপমের দিকে তাকালেন ভ্রূ কুঁচকে, টাটা নগর থেকে কি আপনি একাই উঠেছিলেন ?'

রূপম আশ্চর্য হল, টি টি-র কথার ধরন ভাল ঠেকল না তার কাছে। বলল, হ্যাঁ, একাই তো। আপনার সন্দেহ হচ্ছে না কি ?'

দু-একজন যাত্রীর চোখও হঠাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। বিশেষ করে ব্রাউন-কালারের কোট প্যাণ্ট, হালকা আকাশিরঙা টাই পরা এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, 'ডাউট তো হতেই পারে, বিশেষ করে আপনার অ্যালটেড ক্যুপেই যখন পাওয়া গেছে।'

রূপম স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে বলল, 'স্টপ অল দিস ননসেন্স। কোথায় মেয়েটিকে কী করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় তা ভাববেন, তা নয় তো যতো সব—'

ইতিমধ্যে সংজ্ঞাহীন তরুণী সামান্য নড়াচড়া শুরু করেছে। যন্ত্রণায় তার মুখ চোখ কুঁচকে উঠছে মাঝে মধ্যে। বিস্রস্ত পোশাক,

উস্ক খুস্ক চুলের আড়ালে যে মেয়েটি শুয়ে আছে, এই আধো-অন্ধকারেও মনে হল, সে সুন্দরীই। হয়তো তার চেহারার আলগা চটকই তার সর্বনাশ ডেকে এনেছে একটু আগে।

কিছুক্ষণের মধ্যে চোখ মেলে তাকাল মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝুঁকে পড়া মুখগুলি দৃশ্যমান হতেই হঠাৎ ভীষণ আতঙ্কিত হল। পরমুহূর্তে প্রায় হিস্টিরিয়া রোগীর মতো দুমড়ে-মুচড়ে উঠল তার মুখমণ্ডল। তার দু'হাত ন্যস্ত হল তার শরীরে, কী বুঝল সেই জানে, পরক্ষণেই মুখ বিকৃত করে আবার জ্ঞান হারাল।

রূপমরা নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করল একবার। অত্যাচারিত হওয়ার আগে মেয়েটি যে শেষপর্যন্ত বাধা দিয়ে গেছে, ধস্তাধস্তি করেছে তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে ক্যুপের ভেতর তার চিহ্ন বর্তমান। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার জ্ঞান হারানোর ঘটনাটা দুটো কারণে হতে পারে। হয় তার ওপর অত্যাচারের পরিমাণ খুবই বেশি। অথবা মেয়েটি ভীষণভাবে শকড্। টি টি ভদ্রলোক কিছুক্ষণ মেয়েটির মুখভঙ্গি লক্ষ্য করে হঠাৎ বিড়বিড় করলেন, 'খুব ঝামেলা হবে মনে হচ্ছে।'

রূপম কিছু বলার আগেই কোট-প্যাণ্ট পরা ভদ্রলোক মুচকি হাসলেন ফের, 'রেপ্‌ড্ কেস যখন ঝামেলা তো হবেই। এরপর কোর্টে যদি কেস টেস ওঠে, তখন আপনিও ফেঁসে যাবেন মশাই।'

কথাটা টি টি-কে উদ্দেশ্য করে বলা। ভদ্রলোক এতক্ষণ বেশ একটু নার্ভাস হয়েই ছিলেন, এখন আরও কাবু হয়ে পড়লেন মনে হল। প্রতিবাদ করে বললেন, 'কেন, কেন, আমি কী করতে পারি। কোথাকার মেয়েছেলে, কোথায় যাচ্ছিল, কার সঙ্গে যাচ্ছিল, তা চার্টে লেখা না থাকলে আমি জানব কী করে? হয়তো ট্রেন ছাড়ার আগেই ঘটে গেছে ঘটনাটা।

কোট-প্যাণ্ট পরা লোকটি তাতে আবারও চেপে ধরল টি টি-কে, 'তাহলে তো মশাই আপনার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। ট্রেন ছাড়ার সময় কোন্ ক্যুপে কে আছে তা দেখা উচিত আপনার।'

প্রবলভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলেন টি টি, 'কেন তা দেখতে যাব। আমার চার্টে লেখা আছে, বি ক্যুপে কেউ নেই, দরজা বন্ধ করা

আছে, আমি কেনই বা দেখতে যাব। যে তিনটে ক্যুপে লোক আছে আমি শুধু সেগুলোই দেখেছি।'

রূপম এতক্ষণে ঝেঁঝে উঠে বলল, 'উইল য়ু প্লিজ স্টপ? ঝগড়া-ঝাটি, দোষারোপ করে কারও কোনও লাভ আছে এখানে? ট্রেন স্লো হয়ে এসেছে, সামনেই স্টেশন। কী ভাবে একে হাসপাতালে ভর্তি করা যায়, সে চেষ্টা আগে করুন, তারপর না হয়— ।'

ইস্পাত এক্সপ্রেস ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে ঝাড়গ্রাম। টি টি বিড়বিড় করে বললেন, 'কী জানি, স্ট্রেচার কোথায় পাওয়া যাবে' বলতে বলতে প্ল্যাটফর্মে নেমে হন্তদন্ত হয়ে হাঁটা দিলেন স্টেশনঘরের দিকে রূপম এদিক-ওদিক তাকিয়ে অন্য প্যাসেঞ্জারদের খুঁজতে লাগল, কিন্তু ততক্ষণে ক্যুপের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন প্রায় সবাই। শুধু বাদামি কোট-প্যাণ্ট পরা ভদ্রলোকের দরজা আধ ভেজানো দেখে রূপম মুখ বাড়ালো, 'কী হল, আপনারা সব চলে এলেন যে!'

বাদামি কোট-প্যাণ্ট ঘাড নাড়লেন, 'আপনার ক্যুপেই যখন পাওয়া গেছে, তখন আপনিই হ্যাপা সামলান। এখন হাসপাতালে পাঠানো মানে সঙ্গে সঙ্গে থানা-পুলিশ জড়িয়ে যাবে। তারপর কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াবে কে জানে। ওসব টি টি আর আপনি যা করার করুন।'

ইতিমধ্যে কোত্থেকে দু'জন ঝাড়ুদার টাইপের লোক আর পুরনো একটি স্ট্রেচার নিয়ে ফিরে এসেছেন টি টি, সঙ্গে ঝাড়গ্রাম স্টেশনের স্টেশনমাস্টার। সবাই ধরাধরি করে মেয়েটিকে স্ট্রেচারে তুলে প্ল্যাটফর্মে নামাতেই টি টি ভদ্রলোক হঠাৎ রূপমকে বললেন, 'আপনি সঙ্গে যান মশাই। নইলে আবার কোত্থেকে কী ঘটে যাবে কে জানে —'

'আমি!' রূপম ফাঁপরে পড়ল। রাত্রি পৌনে আটটার কাছা-কাছি। এখন মাঝপথে এমন একটি ঝামেলার সঙ্গে জড়ানো মানে আজ রাতে আর কলকাতা ফেরা যাবে না। স্টেশনে গাড়ি রাখতে বলেছে সেন্টুকে। সেন্টু এসে অপেক্ষা করবে তার জন্য। অরুণিমাও রাত জেগে বসে থাকবে সে কখন ফিরবে তার প্রতীক্ষায়।

ভাবতে না ভাবতে ছাড়ার হুইশল দিল ইস্পাত এক্সপ্রেস। গাড়ি দুলে উঠতেই টি টি ভদ্রলোক তাড়া দিলেন, 'মশাই, আজকাল কাউকে বিশ্বাস নেই। মেয়েটা আবার কার না খপ্পরে পড়বে তার ঠিক কী! আপনি যান—'

কিছু আর ভাবার আগেই রূপম নেমে পড়ল কিছুটা গতি নিয়ে নেওয়া ট্রেন থেকে। তখনও প্লাটফর্মের উপর স্ট্রেচারে শুয়ে আছে সংজ্ঞাহীন মেয়েটি। একটু কাতরানিও শোনা যাচ্ছে তার গলা থেকে। স্টেচারের উপর বিসদৃশভাবে হুমড়ি খেয়ে দেখছে স্টেশনের কিছু উটকো লোক। দৃশ্যটা ভারি বিশ্রী ঠেকল রূপমের কাছে। সে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে স্টেচার ধরা লোক দুটিকে তাড়া লাগায়, 'উঠিয়ে জলদি—'

মার্চের শেষ, তবু শীতের প্রকোপ এখনও যায়নি এখানে। সবার শরীরেই জড়তা। কলকাতার চেয়ে এ-সব অঞ্চলে চার পাঁচ ডিগ্রী নিচেই থাকে তাপমাত্রা। রূপম তার হালকা জামা কাপড়ে মোড়া শরীরে টের পেল হাড়কাঁপুনি কাকে বলে। ঝাড়ুদার দু'জন তাদের মাথা-কান-মুখ-নাক সব আষ্টে পৃষ্ঠে ঢেকে রেখেছে চাদরে গামছায়। রূপমের তাড়া তেমনভাবে বোধ হয় পেঁছিল না তাদের কানে। তাদের জড়ভরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্টেশনমাস্টার তাদের একজনের পিঠে গুঁতো দিয়ে বলল, 'তোলো, তোলো—'

সেই রাতে স্টেচারসহ মেয়েটিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো রূপমের জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা। প্রথমে হাসপাতালে, তারপর পুলিশের কাছে কত না জবাবদিহি করতে হল তার ইয়ত্তা নেই। সে যেহেতু ট্রেন থেকে মেয়েটির সঙ্গে এসেছে, অ্যাডমিশনের খাতায় গার্জেন হিসেবে তারই নাম লিখলেন হাসপাতালের এস ডি এম ও ডঃ দন্ডপাট। অতএব ঘটনাটির যাবতীয় দায়ভার যেন বর্তালো তারই ঘাড়ে।

জবাবদিহির ফাঁকে ফাঁকে রূপম চেষ্টা করতে লাগল তার ফ্ল্যাটে একটা টেলিফোন করার। তার ফেরার অপেক্ষায় অরুণিমা বসে থাকবে। হঠাৎ ফ্ল্যাটের বাইরে কোনও গাড়ির হর্ন শুনলে চমকে

উঠে ব্যালকনিতে গিয়ে দেখবে, সেন্টুর গাড়ি ফিরল কি না। না দেখে চিন্তায় পড়বে। সেন্টুও স্টেশনে বসে থাকবে বহুক্ষণ।

অরুণিমা অবশ্য ভীষণ উৎকণ্ঠিত হবে। মনে মনে ভাববে, রূপম তো কথার নড়চড় করে না। তার বাড়ি থেকে বেরুনো, বাড়িতে ফেরা সবই মোটামুটি রুটিন মাফিক। ট্যুরে বেরুলেও সে যেদিন ফেরার কথা ঠিক ঠিক সময় ফেরে।

কিন্তু কোনরকম টেলি যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হল রূপম ওদিকে মেয়েটিকে সে রাতে হাসপাতালে ভর্তি করার সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হল সার্জেনকে। তিনি অবশ্য প্রভাবিত ভাবে দ্রুত এসে রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, 'এখুনি অপারেশন করাতে হবে। ব্লাডও লাগবে কয়েক বোতল।'

বলতে গেলে গোটা রাত বিনিদ্র কেটে গেল রূপমের, তার শরীর থেকে এক বোতল রক্তও চালান হয়ে গেল অচেনা মেয়েটির শিরায় শিরায়। সারারাত অচেতন অবস্থায় কাটার পর পরদিন সকালে চোখ মেলল মেয়েটি। ডাক্তার তখন হুমড়ি খেয়ে রয়েছেন তার বেডে। সতর্ক দৃষ্টিতে নজরে রেখেছেন তার প্রতিক্রিয়া। প্রথমে কী যেন খুঁজল, আরও বহুক্ষণ পর কথা বলল সে। কথা নয় প্রায় প্রলাপই। প্রথমে কিছুই মনে করতে পারল না, তারপর অসংলগ্ন কিছু সংলাপ। তাতে তার নামটুকু জানা গেলেও পরিষ্কার হল না, কী পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এহেন একটি ভয়ংকর ঘটনার শিকার হতে হয়েছিল কাল।

মেয়েটির নাম সায়ন্তনী। সায়ন্তনী মজুমদার। দুপুরের মধ্যেই যখন ডাক্তারের মতে সে বিপদসীমার মোটামুটি বাইরে, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে রূপম ডাক্তারকে জানালো, সে এবার কলকাতা ফিরতে চায়। এতক্ষণে তার জন্য হয়তো থানা পুলিশ করে ফেলেছে অরুণিমা। ডাক্তার দণ্ডপাট তৎক্ষণাৎ বললেন, আবার কবে আসছেন? পেশেন্টকে আরও দু'-তিনদিন অবজারভেশনে রেখে তারপর রিলিজ করে দেব।

রূপম ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না ডাক্তার কী বলতে চাইছেন, তবুও যে ক্ষীণ ত্রাসটুকু তার শরীর ঘিরে ছিল, তাইই পরিষ্কার

করে বললেন ডাক্তার দণ্ডপাট, পেশেণ্টের সঙ্গে আপনি কথা বলেছেন? —পেশেণ্ট তার সেন্স ফিরে পাওয়ার কিছুক্ষণ পরই বলল. আমাকে বাঁচানো হল কেন? আমি এখন কোথায় যাব?

রূপম একটু ভেবে নিয়ে বলল, ওকে তার বাড়িতেই ফেরত পাঠাতে হবে। পুলিশ যখন খুব ইণ্টারেস্ট নিয়ে তদন্ত করছে, এ দায়িত্বটুকু তো তাদেরই নিতে হবে।

ডাক্তার দণ্ডপাট হাসলেন, কাল ওরা ইণ্টারেস্ট নিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ইণ্টারোগেট করে যখন বুঝে গিয়েছে যে, মেয়েটি তার অতীত ইতিহাস বলতে পারছে না. বিশেষ করে এও বুঝেছে যে, আপনি কেবলই ত্রাণকর্তা, অন্য কোনওভাবেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন, তখন আর এদিকে কেউ ঘেঁসছে না। এখন যেহেতু হাসপাতালের রেজিস্টারে আপনারই নাম লেখা আছে, আমরা আপনাকেই তার বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলব।

রূপম থতমত খেয়ে বলল, বাহ্ বেশ বলছেন তো। কাল আমি ঝুঁকি নিয়ে মেয়েটিকে হাসপাতালে ভর্তি করলাম বলে সব দায়িত্ব কি আমারই ওপর বর্তাবে নাকি।

কিছুটা বর্তায় বইকি মিঃ রায় আপাতত আপনিই যখন জীবনদাতা, তখন বাকি কাজটুকু আপনাকেই করতে হবে। এতদূর যখন করলেন—

কাল থেকে কলকাতা ফিরতে পারেনি বলে রূপম এমনিতেই ভীষণ টেনশনে আছে। সে খবর নিয়ে জেনেছে, আজ দুপুরের দিকে পরপর দুটো ট্রেন আছে হাওড়া যাওয়ার, একটা পৌনে তিনটেয়, আর একটা সাড়ে তিনটেয়। তার একটা ধরতেই হবে তাকে।

তার ভাবনার মাঝখানেই ডাঃ দণ্ডপাট আবার বললেন, আপনাকে দেখেই বুঝেছি. আপনি পরোপকারী মানুষ। এমন উটকো ঝামেলার সঙ্গে যখন নিজেকে একবার জড়িয়েছেন, তখন বাকি কাজটুকু আপনিই করুন।

—কিন্তু যে মেয়েটিকে আমি জানি না, চিনি না, তাকে

পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে কেন বুঝতে পারছি না। একটু সুস্থ হলে ও নিজেই চলে যাবে।

—যদি না যেতে পারে তাহলে কিন্তু আপনাকেই আবার ডিস্টার্ব করব বলে রাখছি, মিঃ রায়। আপনার অফিসের ফোন নম্বর তো নিয়ে রেখেছি।

হাসপাতালের ঝামেলা থেকে কোনও রকমে অব্যাহতি নিয়ে হাতিয়া এক্সপ্রেস ধরে রূপম যখন কলকাতায় তার ফ্ল্যাটে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে সাড়ে সাতটার মতো। ফিরে দেখল, বাড়িতে প্রায় শোকসভা বসেছে। অরুণিমা কাল থেকে অস্থির হয়ে চারদিকে টেলিফোন করেছে, এমনকি অফিস থেকে ফোন করিয়েছে জামশেদপুরেও, বজরাংলালের ওখান থেকে জানতে পেরেছে, রূপম গতকাল ইস্পাত এক্সপ্রেসেই চড়েছে। আর তাতেই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বাড়িতে। যে মানুষটা সন্ধ্যের সময় ট্রেনে চড়েছে, সে রাতে কেন হাওড়া পৌঁছল না এই ভাবনাতে চারদিকে তোলপাড় করে ফেলেছে। এমনকি লালবাজারে ফোন করে কথা বলেছে রূপমের পরিচিত এক বন্ধুর সঙ্গেও।

সে ঘরে পা দেওয়া মাত্র প্রায় হামলে পড়ল অরুণিমা, কোথায় ছিলে তুমি কাল থেকে?

রূপম তখন সময় নিচ্ছে ভেবে নেওয়ার, কী অজুহাত দিলে অরুণিমার রাগকে সামাল দিতে পারে এই মুহূর্তে। ট্রেনের ঘটনাটা বলা উচিত হবে কি হবে না এমন ভাবতে ভাবতে বলল, হঠাৎ খুব জরুরি কাজে আটকে গেলাম। খুব চেষ্টা করেছিলাম ফোনে খবরটা দিতে, কিন্তু যোগাযোগ করা গেল না।

অরুণিমার দাদা রীতায়ন বলল, আমরা তো ভেবেছিলাম আপনাকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে কেউ। লালবাজারে সে রকমই হিন্টস দিয়েছে অরুণিমা।

রূপম আপত্তি না করে ঘাড় নাড়ল, সত্যিই হাইজ্যাকড হয়েছিলাম বলতে পারেন। হঠাৎ কোম্পানির এক ক্লায়েন্টের সঙ্গে ট্রেনের কামরায় দেখা। ঝাড়গ্রামে নতুন একটা ইন্ডাস্ট্রি করছেন, তাইই দেখাবেন বলে জোর করে নামালেন ট্রেন থেকে। বললেন,

আরব-কাণ্ট্রিগুলোতে এক্সপোর্ট করার অনেকগুলো চ্যানেল পেয়েছি। আমার প্রোডাক্টের সঙ্গে আপনাদের সিল্কও পাঠাতে পারি। ওদের ওখানে সিল্কের চাহিদা ভীষণ বেড়েছে। তা উনিই বললেন, 'বাড়িতে এখনই ট্রাংককল করে জানিয়ে দিচ্ছি, আপনার কোনও চিন্তা নেই। কিন্তু আনফরচুনেটলি কোনও লাইনই পাওয়া গেল না।'

চট্ করে একটা মিথ্যে অজুহাত মাথায় এসে গেল বলে রূপম ভাবল সে রেহাই পেল। যদিও এ ধরনের মিথ্যে বলতে সে একেবারেই পটু নয়। ভালও লাগে না তার। কিন্তু অরুণিমা তার জবাবে মোটেই সন্তুষ্ট হল না, বলল, তা ক্লায়েণ্টের সঙ্গে গল্প করতে কাল সন্ধে থেকে আজ সারাদিন লেগে গেল?

—সকালে উঠেই নিয়ে গেলেন স্পটে, যেখানে প্ল্যাণ্ট তৈরি হচ্ছে ওঁর। প্রায় চারকোটি টাকার প্রোজেক্ট। বললেন, বেশিক্ষণ লাগবে না, কিন্তু ওখানকার ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দুপুর হয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে খেয়েদেয়ে ট্রেন পেতে পৌনে তিনটে বেজে গেল।

আষাঢ়ে গল্প শুনে অরুণিমার মুখে তখন আষাঢ়ের মেঘের ঘনঘটা। এতক্ষণে তার দুশ্চিন্তার অবসান হতে রাগ আর অভিমানে ওতপ্রোত হয়ে পায়ে ধপ্‌ধপ্ শব্দ তুলে চলে গেল অন্য ঘরে।

বেশ কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর মুহূর্ত কাটানোর পর যখন সে বলতে পারল, তা ঝগড়া করেই কি কাটাবে সারা রাত! এতটা জার্নি করে এলাম, এককাপ চা-ও তো পেতে পারি, না কি? ঠিক সেই মুহূর্তে তার নজরে পড়ল, অফিস থেকে একটা জরুরি নোট এসে পড়ে আছে টি ভি'র ওপর, পেপার ওয়েট দিয়ে চাপা। দ্রুত গিয়ে হাতে তুলে চোখ বোলাতেই হঠাৎ একটা প্রবল ধাক্কা খেল সে। এম ডি'র নোট, তাতে লেখা, জাপানে যে সিল্ক-মেটেরিয়ালস যাওয়ার কথা, প্যাকিং-এর সময় ধরা পড়েছে সমস্ত মালটাই বাজে কোয়ালিটির। পনের লাখ টাকার অর্ডার শেষ মুহূর্তে ক্যানসেল করতে হয়েছে।

৫

পরদিন অফিসে পেঁাছেই রূপম শুনল, যে তিন দিন সে ছিল না, তার মধ্যে প্রলয়ংকর সব কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। হঠাৎ কারও নজরে পড়েছে, জাপানে যে সিল্কথান পাঠানো হচ্ছিল, তা খুবই নিম্ন মানের। চেয়ারম্যানের কানে খবরটা অতি তৎপরতায় পেঁাছে দিয়েছে কেউ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফায়ার। এম ডি'কে ডেকে বলেছেন, এক্ষুনি তদন্ত করুন, কার গাফিলতিতে এত বড় একটা অর্ডার হাতছাড়া হল। যে কোয়ালিটির থান পাঠানোর কথা, তার বদলে অন্য কোয়ালিটির মাল গোডাউনে ঢুকল কী করে। এনকোয়ারি করে দেখুন, কোন কোয়ালিটির মাল অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, কোন কোয়ালিটি ঢুকেছে, কেনই বা সেগুলো চেক্ না করে রিসিভ করা হয়েছে, তারপর না দেখেশুনে প্যাকিংই বা হল কী করে? যে-যে রেসপনসিব্ল্, এভরিওয়ান উইল বী স্যাক্ড্।

সমস্ত অফিস তখন টেনশনে থমথম করছে। যে-যে ওই বিশাল পরিমাণ সিল্ক-থান কোনও না কোনও ভাবে ছুঁয়েছে সবাই আতংকে প্রায় নীল হয়ে রয়েছে। এম. ডি তৎক্ষণাৎ তদন্তের ভার দিয়েছেন রূপমের ওপর, জেনারেল ম্যানেজার উইল প্লিজ ইনভেস্টিগেট দ্য ম্যাটার অ্যান্ড সাবমিট অ্যা রিপোর্ট উইদিন সেভেন ডে'জ। রূপম অফিসে জয়েন করার সঙ্গে সঙ্গে সেই আতঙ্কের ঢেউ ছুঁয়ে গেল তার টেবিল। নিচুতলার কর্মীরা তো বটেই, ম্যানেজারিয়াল র‍্যাঙ্কের অনেক অফিসারও যে বেশ দুশ্চিন্তায় আছে তা উপলব্ধি করতে পারল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

কিন্তু রূপম নিজেই কি কম দুর্ভাবনায় আছে! বিদেশ থেকে একটা অর্ডার সংগ্রহ করতে কালঘাম ছুটে যায় তাদের। এক্সপোর্ট মার্কেট এতটাই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ যে কনসাইনমেণ্ট পার্টির হেপাজতে না পেঁাছানো পর্যন্ত স্বস্তি থাকে না। বিশেষ করে এতবড় একটা অর্ডার।

এবং বেশ লাভজনক অর্ডারও বটে। প্রায় মাস দুয়েক আগে জাপান থেকে কোয়ারিটা পাঠিয়েছিলেন ইয়াসুনারি নাকাচাবি নামের এক যুবক। রূপম খুবই তৎপরতার সঙ্গে স্যাম্পেল-কার্ড, তার সঙ্গে কোন থান কতটা পাওয়া যাবে ও তাদের এখনকার রেট কোট করে জানিয়েছিল তাকে। তারপর বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করার পর যখন অর্ডার পাওয়ার ব্যাপারে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিল, ঠিক সে সময় নাকাচাবি একদিন হঠাৎ তাদের অফিসে এসে হাজির। তাদের কোম্পানির প্রোডাকশন নিজের চোখে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তক্ষুণি একলপ্তে পনের লক্ষ টাকার অর্ডার দিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে দশ হাজার ডলারের একটি চেক। সেদিন কোম্পানিতে প্রায় উৎসবের পরিবেশ। একসঙ্গে এতগুলো বিদেশি মুদ্রা হাতে এসে যাওয়ায় অফিসের টপ টু বটম লোকজন সবাই উত্তেজিত। তারপর বোর্ড-মিটিং-এ চেয়ারম্যান রূপমের প্রশংসা করে বলেছিলেন, হি হ্যাজ ডান অ্যা গ্রেট জব।

তারপর কয়েকদিন ধরে চিফ প্রকিওরমেন্ট অফিসার অমিত্র চট্টরাজ রামপুরহাটে লোক পাঠিয়ে তাঁতিদের কাছে অর্ডার দিয়ে এসেছে যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পৌঁছে যায় সিল্ক থানগুলো। এক্সপোর্ট ম্যানেজার বর্ণিল দত্তগুপ্তর সঙ্গে বসে ছক করে দিয়েছিল কোথা থেকে কীভাবে আসবে মালগুলো, কোথায় এবং কোন তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে। জামসেদপুর যাওয়ার আগের দিনই খবর পেয়েছিল, বর্ণিল দত্তগুপ্ত তার বিশাল বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তুলে এনেছে পনের লক্ষ টাকার সিল্ক-থান। সংবাদটি পেয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনেই সে রওনা দিয়েছিল ইস্পাত এক্সপ্রেসে। তারপর এত কাণ্ড—

ইতিমধ্যে ফনোকমে পিঁক পিঁক আওয়াজ হতে রিসিভার তুলে শুনল এম. ডি-র গলা, প্রকিওরমেন্ট দপ্তরের ইনচার্জ কদম বসাককে সাসপেণ্ড করা হয়েছে আজই। জি. এম-এর রিপোর্ট পেলে বাকি অ্যাকশন নেওয়া হবে।

ওপাশে ফনোকমের লাইন পট করে কেটে গেল অর্থাৎ রূপমের কথা আর শোনার সময় নেই এম. ডি-র। রিসিভার

হাতে ধরে তখনও কিন্তু বিস্ময়ে থম্ হয়ে আছে রূপম। কদম বসাকের সাসপেন্ড হয়ে যাওয়ার ঘটনটাই তার কাছে একাধারে বিস্ময়ের এবং ভাবনারও বটে। কদম এ কোম্পানির অন্যতম সিল্ক বিশেষজ্ঞ। তার পেটে পুঁথিগত কোনও বিদ্যে নেই বললেই চলে। সে বীরভূমের রামপুরহাট মহাকুমার বাসিন্দা। রামপুরহাট থেকে প্রায় মাইল কয়েক দূরে এক গাঁয়ে তার বাড়ি। সে গাঁয়ে রেশম তাঁতিদের বাস। গ্রামের চারপাশেই মাইলের পর মাইল তুঁতে গাছের চাষ হয়। সে গাছের পাতায় রেশমকীট বেড়ে ওঠে, ডিম পাড়ে, বাচ্চা হয়, তারা বড় হয়, আবার ডিম পাড়ে ইত্যাদি। রেশমকীটের লার্ভা থেকেই তৈরি হয় রেশমসুতো। জন্ম থেকেই এহেন রেশমচাষের মধ্যে মানুষ হয়ে কদম বসাক রেশম সম্পর্কিত যাবতীয় অভিজ্ঞতায় এখন একজন দুঁদে বিশেষজ্ঞ। সিল্ক কাপড়ে একবার আঙুল ছুঁইয়ে সে নিমেষে বলে দিতে পারে, সেটা কোথাকার সিল্ক, কত ডেনিয়রের সিল্কসুতোয় বোনা দি ওয়ার্ল্ডওয়াইড সিল্ক ট্রেডিং কোম্পানির যে ক'জন অ্যাসেট আছে, তার মধ্যে কদম বসাক অবশ্যই একনম্বরে পড়ে। সেই কদম বসাককে এম ডি. কোনও প্রাথমিক রিপোর্ট ছাড়াই সাসপেন্ড করে দিলেন।

ঘটনাটা কীভাবে এনকোয়ারি করবে, কবে আরম্ভ করবে এমন ভাবতে ভাবতে তার টেবিলে জমে থাকা গত তিনদিনের ফাইল ডিস্পোজালে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। যেগুলো জরুরি কিংবা যে চিঠিগুলোর এখনই উত্তর দেওয়া দরকার সেগুলো সটাসট একপাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে শুধু রুটিন ফাইলগুলোয় সই মারছিল, অথবা কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে তা দু-এক লাইনে লিখে টেবিলের ওপাশে রাখা বাস্কেটে রাখছিল একে একে। ঘন্টা দুয়েকের চেষ্টায় যখন অর্ধেক ফাইলও টেবিল মুক্ত করে উঠতে পারেনি, ঠিক সেসময় তার চেম্বারের সুইং দরজা ঠেলে মাথা বাড়ালেন ফিন্যান্স অফিসার রমিত ভদ্র, জি-এম-সাহেব খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে?

সামনে ছড়ানো ফাইল থেকে মুখ তুলল রূপম, আপনি কি আমার চেয়ে কিছু কম ব্যস্ত?

রমিত ভদ্র হাসতে হাসতে বসলেন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে,

তারপর একটু গলা নামিয়ে বললেন, যা কাণ্ড চলছে ক'দিন ধরে, আপনি তো দিব্যি ট্যুর করছেন তখন, এদিকে আমরা সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছি—

রূপম ঠোঁটের কোণে আলতো হাসি ঝুলিয়ে বলল, তার কিছু-কিছু কানে এসেছে সকাল থেকে। খুবই স্ট্রেঞ্জ কিন্তু ব্যাপারটা।

—আমি তো মশাই সব শুনেটুনে তাজ্জব। আপনি এত পরিশ্রম করে বড় একটা অর্ডার জোগাড় করলেন, সেই জাপানিটা দশ হাজার ডলার নগদে অ্যাডভান্স করে গেল. আর প্রকিওরমেন্ট সেকশন হাসতে হাসতে ডুবিয়ে দিল গোটা ব্যাপারটা !

রূপম গম্ভীর হল, শুধু প্রকিওরমেন্টের ওপর দোষ চাপিয়ে দিলে তো হবে না মিঃ ভদ্র, এতজন অফিসার রয়েছে প্রকিওরমেন্ট ডিপার্টমেন্টে, কেউ একবার গোডাউনে ঢুকে দেখল না, যে কোয়ালিটির থান আসার কথা ছিল তা এল কি না !

রমিত আবার গলা খাদে নামালেন, আসলে এর ভেতর অনেক ভেস্টেড ইন্টারেস্ট কাজ করছে। নিশ্চয় কয়েক লক্ষ টাকার লেন-দেন হয়েছে ভেতরে ভেতরে। ভেবেছিল কোনও ক্রমে একবার প্যাকিং করে এয়ারে পাঠিয়ে দিতে পারলেই কাজ ফতে। ভ্যাগিস চেয়ারম্যান হঠাৎ সেইসময়ে ঢুকে পড়েছিলেন গো-ডাউনে। তাতেই—

—কিন্তু কদম বসাক এর মধ্যে জড়িত, ব্যাপারটা ভাবতেই আমার কাছে খারাপ লাগছে। লোকটা এতবছর সিনসিয়ারলি কাজ করছে—

—সেটা অবশ্য আমার কাছেও খট্‌কা লেগেছিল প্রথমটা। কিন্তু চেকিং-স্লিপ আনিয়ে দেখলাম, প্রতিটি স্লিপেই কদম বসাকের সই আছে। কদম বসাকের পাশে প্রকিওরমেন্ট ম্যানেজারের সই।

রূপম কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে থম্ হয়ে থেকে বলল, প্রকিওর-মেন্ট ম্যানেজার চিরকালই বড় বেশি ডিপেণ্ড করেন সাব-অর্ডিনেট অফিসারদের ওপর। কদম বসাককে উনি খুবই নির্ভরযোগ্য ভাবেন এ-কথা ঠিক। কিন্তু এত টাকার মাল যাচ্ছে বিদেশে, সেক্ষেত্রে একবার গো-ডাউন ঘুরে ঘুরে দেখা উচিত ছিল ওঁর।

ফিনান্স অফিসার মুচকি হেসে বললেন, চট্টরাজ তো শুধু প্রকিওরমেণ্ট দপ্তরের ইন-চার্জের ওপরই নির্ভর করেনি। ডেপুটি প্রকিওরমেন্ট ম্যানেজার বিনীথ শাসমলকে উনি লিখিত অর্ডার দিয়েছিলেন পুরো ব্যাপারটা দেখভাল করার জন্য। সাসপেণ্ড করতে হলে শাসমলকেও করা উচিত।

রূপম প্রতিবাদ করে বলল, বিনীথ শাসমলের কী করার আছে। সে তো সবে একবছর জয়েন করেছে এই কোম্পানিতে। এখনও সিল্ক সম্পর্কে তার কোনও আইডিয়াই হয়নি। কদম বসাকই তো এক্সপার্ট হিসেবে কোয়ালিটি ও. কে. করে।

—বাহ্। এদিকে এইসব নতুন ছেলেরা টেক্সটাইলের ডিগ্রি নিয়ে এসে নিজেদের কেউকেটা মনে করে। কদম বসাককে তো পাত্তাই দেয় না ওরা। বলে, কদম বসাক হাতুড়ে ডাক্তার, নাড়ি টিপে রুগী দেখার দিন এখন চলে গেছে। দেখেননি, সবসময় পকেটে ওই যে লেন্সের মতোন কী একটা যন্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করে। কোনও নতুন থান এলেই অমনি তার ওপর লেন্স চাপিয়ে দেখবে। কদম বসাক যে সিল্কথান কেবল হাত দিয়ে পরখ করে, খালি চোখে দেখে তার কোয়ালিটি বলে দেয় তাতেও ওদের কাণ্ডজ্ঞান হয় না।

—বিনীথ শাসমল কি থানগুলোর কোয়ালিটি টেস্ট করেছিল ?

– না করবেই বা কেন, জি. এম সাহেব। গত তিনদিন তো সারাক্ষণই যাতায়াত করেছে গো-ডাউনে। যারা থান জমা দিতে এসেছিল, তাদের সঙ্গে কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলেছে, কদম বসাক চালানে সই করার পর তার পাশে সই করেছে, এখন দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইলে হবে কেন ?

—বিনীথ শাসমল কী বলছে এখন ?

—বলছে, কোম্পানি এক্সপার্ট হিসেবে যখন কদম বসাককেই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়েছে, তখন সোল্ রেসপনসিবিলিটি তারই।

—হুঁ। রূপম একটু গম্ভীর হল। ফিনান্স অফিসার চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরও সমস্যাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল একা-একা। আজ জয়েন করার পর এরকম টুকরো টুকরো অনেক মতামত পেয়ে যাচ্ছে এর-ওর কাছ থেকে। ফাইল খুঁজতে

আসার ছল করে ফিসফিস করে কয়েকটা কথা বলেও গেল একজন। এনকোয়ারি শুরু করার আগে বিষয়টি সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা এই সব টুকটাক তথ্যের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এনকোয়ারি শুরু হলে অবশ্য আরও অনেক কিছু ব্যাপার ফাঁস হয়ে যায়। হয়তো অন্য দিকে টার্ন নিয়ে নেবে ঘটনাটা। যাই হোক, আপাতত কীভাবে শুরু করা যায় তার একটা ছক কষে নেবে বিকেলে বসে। তার আগে রিসিভিং দপ্তরের পিওন কয়েকটা খাম দিয়ে গেল তাইই খুলতে বসল সে।

পাঁচটা খামের প্রথমটি এলেবেলে চিঠি, কিন্তু দ্বিতীয় খাম ট খুলতেই লাফিয়ে উঠল মনে-মনে। সুইজারল্যাণ্ডের একটা কোয়ারির জবাবে স্যাম্পল-কার্ড পাঠিয়েছিল মাস দুয়েক আগে। সেখা। থেকে প্রথম ক্ষেপে পাঁচ হাজার ডলারের একটা অর্ডার এসেছে। যদি ওখানকার মার্কেটে মালটা ধরে যায় তা হলে পরে পরে আরও অর্ডার দেবে বলে জানিয়েছে ওরা।

সুইজারল্যাণ্ডে ইণ্ডিয়ান সিল্কের ভাল চাহিদা আছে তা আগেই জানতো রূপম। ব্যাঙ্গালোরের এক্সপোর্টাররা বছরে কয়েক লক্ষ ডলারের অর্ডার পাচ্ছে গত কয়েক বছর। তাদের টার্ন-ওভার নাকি হু-হু করে বাড়ছে। কলকাতার এক্সপোর্টাররা ধরতেই পারছে না সে বাজার। এখন রূপম যদি ব্যাপারটা থ্রু করতে পারে, তাহলে তাদের কোম্পানির রমরমা বাড়বে।

ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে বেশ একটু থ্রিল্‌ড্‌ হয়েই দ্রুত ফনোকমের বোতামে হাত দিল, হ্যালো, মিঃ দত্তগুপ্ত— ?

ওপাশ থেকে বর্ণিল দত্তগুপ্তর গলা শোনা গেল, ইয়েস—

—জি. এম বলছি। সুইজারল্যাণ্ড থেকে 'গ্রিন হেভেন' নামে একটা কোম্পানি রেসপণ্ড করেছে। ফার্স্ট ইনস্টলমেণ্ট ডেসপ্যাচ করতে হবে সাত দিনের মধ্যে। আপনাকে ফাইল পাঠাচ্ছি এক্ষুনি। হয়তো আমাদের স্টকেই পেয়ে যাবেন মালটা।

—নো প্রব্লেম, জি. এম সাহেব।

—দেখবেন, আবার জাপান-কেলেঙ্কারি না হয়ে যায়।

প্যাকিংয়ের আগে আপনি একবার সেকশনে ঢু দিয়ে এলেই—, বলে একবার হাসল রূপম, তারপর বলল, ও. কে. ?

সুইজারল্যাণ্ডের কাগজপত্রগুলো গোছগাছ করতে করতেই একবার সুইজারল্যাণ্ডের ভূ-স্বর্গের চেহারাটা মাথায় চক্কর দিল তার। খুব বড় অর্ডার পেলে একবার সেখানে যাওয়ার সুযোগও হয়ে যেতে পারে এমন ভাবনাও মাথায় খেলে গেল একবার। অবশ্য যাওয়ার আমন্ত্রণ এলে এম ডি. নিশ্চয় নিজের জন্যই টিকিট কাটবেন, জি. এম-এর জন্য নয়। হঠাৎ কেন যে গোয়া যাওয়ার ইনভিটেশনটা রূপমকে দিলেন !

গোয়ার সী-বিচের দৃশ্যটাও আবার একলহমা ঘাই দিয়ে উঠল তার মাথায়। এখনও প্রোগ্রামটা বলেনি অরুণিমাকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে বলে সারপ্রাইজ দেবে ঠিক করেছে। যাওয়ার কথা শুনলে অরুণিমা কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। টিটো তো নিশ্চয় দু'হাত তুলে নাচবে। তার স্কুলের এক বন্ধু নাকি গত বছর গোয়া ঘুরে এসে রোজ তার গল্প শোনায়। তারপর থেকে টিটো প্রায়ই বলে, বাবা, গোয়া নিয়ে যাবে আমাদের ?

'ঠিক আছে, যাওয়া যাবে এক সময়' বলেও আর হয়ে উঠছিল না। এতদিন পর হঠাৎ আচমকা এসে গেল সুযোগটা। আর ক্লায়েন্টের আমন্ত্রণে যাওয়া মানেই আরও বেশি কমফোর্ট, আরও বেশি ঘোরাঘুরির সুযোগ। সব চেয়ে বড় কথা, নিখরচায়। নিখরচায় হলে হোটেলের আরাম আরও বেশি মনে হয়। নিজের গাঁটের পয়সায় আরাম কিনতে গেলে বড় খচ্‌খচ্‌ করে গায়ে লাগে।

কিন্তু ওই সময় টিটোর স্কুলে কোনও এক্‌জ্যাম্‌ নেই তো ? ওদের তো সারা বছরই উইক্‌লি টেস্ট, মান্থলি, কোয়ার্টারলিতে ব্যস্ত থাকতে হয়। বরং অরুণিমার সঙ্গে ক'দিন পরে এ নিয়ে একটু আলোচনা করে নিতে হবে।

সুইজারল্যাণ্ডের কাগজগুলো নিয়ে সবে একটা ফাইল তৈরি করতে শুরু করেছে, সে-সময় অপারেটার তার ঘরে ফোনের লাইন দিল। রূপম রিসিভার তুলতেই ওপাশে নারীকণ্ঠ শুনতে পেল, স্যার, কারুবাকী মিত্র বলছি—

রূপমের ভুরুতে ভাঁজ পড়ে, হুঁ, কী বলছেন—

—আপনি কি ফ্রি আছেন বিকেলের দিকে, একটু দেখা করতে চাই।

দ্রুত মুখচোখ শক্ত হয়ে উঠল রূপমের, কী দরকার।

—সেই দরকারটাই, যে জন্য গিয়েছিলাম আপনার কাছে।

—স্যরি মিস মিত্র। এজন্যে আমার দরকার নেই। বলেই পট্ করে ফোনের লাইন কেটে দিল রূপম। দারুণ একটা বিরক্তির ছাপও ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। বিড়বিড় করে কিছু একটা বললও যেন। তারপর কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে বসে রইল চেয়ারে গা এলিয়ে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে নিজেকে গুছিয়ে যখন আবার ফাইলে হাত দিয়েছে, তখনই ফনোকমের শব্দ। দু'নম্বর বোতামটা এম. ডি-র। রিসিভার দ্রুত তুলতেই ওপাশ থেকে হিরণ সান্যালের গলা, একবার আমার ঘরে এসো তো, রূপম।

ওপাশে ফোন কেটে যেতেই রূপমের মাথায় আবার একরাশ চিন্তার বোঝা। এম. ডি যা বলার সাধারণত ফনোকমেই বলে দেন, কখনও খুব জরুরি না থাকলে এভাবে তাঁর চেম্বারে যাওয়ার জন্য বলেন না। তাহলে হঠাৎ কী এমন জরুরি প্রয়োজন ঘটে গেল যার জন্য পি. এ মারফৎ না ডেকে নিজেই ডেকে পাঠালেন তাঁর চেম্বারে! তা হলে কি জাপানের ব্যাপারটাই তার সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে! কোনও ক্লু পেয়েছেন নিজে? না কি —

না কি কারুবাকী মিত্রকে রিফিউজ করেছে বলে সে আবার ফোন করেছে এম. ডি-কে। তাইই এম. ডি. তাকে ডেকে পাঠালেন এক্ষুনি। হয়তো ফনোকমে নয়, সামনাসামনি তাকে অনুরোধ করবেন কারুবাকী মিত্রকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার জন্য! যদি তাই করেন তাহলে—

তাহলে কী করবে রূপম তাইই ভাবতে ভাবতে মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে উঠল। সে সরাসরি এম. ডি-কে বলে দেবে, কাজটা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এম. ডি. ইচ্ছে করলে তার কাছ থেকে ফাইল নিয়ে নিজেই নিয়োগপত্র দিতে পারেন কারুবাকীকে।

মাথা কিছুটা গরম করেই দ্রুত গিয়ে ঢুকে পড়ল এম. ডি-র চেম্বারে। গিয়ে দেখল, দুই সাহেব ঘর আলো করে বসে আছে এম. ডি-র সামনে। টেবিলে তিনকাপ গরম কফি। রূপম গিয়ে বসতেই পায় ম্যাজিকের মতো তার সামনে ধূমায়িত কাপ এনে রাখল এম. ডি-র আর্দালি রামবিলাস।

এম. ডি আলাপ করিয়ে দিলেন চোস্ত ইংরেজিতে. দুই সাহেব এসেছেন খোদ আমেরিকা থেকে। ক্যালকাটার মার্কেট যাচাই করতে করতে কোত্থেকে সন্ধান পেয়েছেন তাদের দি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সিল্ক ট্রেডিং কোম্পানির। দুই সাহেব মিঃ রেনল্ড আর মিঃ পিয়ার্সন লস এঞ্জেলসে গড়ে তুলেছেন এক বিশাল গারমেন্ট স্টোর। সেখানে পৃথিবীর তাবৎ ডিজাইনের পোশাক সংগ্রহ করে চলেছেন বহু পরিশ্রমে। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন দু'জনে, আর যে-দেশের যা কিছু অভিনব পোশাক তাইই অডার দিয়ে কিনছেন স্পটে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বুক করে দিচ্ছেন এয়ারে। দুই সাহেবের রকম সকম ভারী মজার। মাঝেমধ্যে চোখ কপালে তোলে, কাঁধ ঝাঁকায়, আবার হা-হা করে দিলখোলা হাসি হাসে।

রেনল্ড আর পিয়ার্সনের আপাতত লক্ষ্য ইণ্ডিয়া থেকে রকমারি সিল্ক স্কার্ফ সংগ্রহ করা। আমেরিকার মেয়েদের মধ্যে হঠাৎই নাকি সিল্ক স্কার্ফ পরার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। ক্রেজ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তারা ভাল একটা ব্যবসা করতে চায়।

এম. ডি. তাকালেন রূপমের দিকে, সাহেবরা আপাতত হাজার পঁচিশেক স্কার্ফ চায়। প্রোডাকশন ম্যানেজারের সঙ্গে আমি কথা বলে নিয়েছি। দিন পনের টাইম চেয়েছে তৈরি করে দেওয়ার জন্য। সাহেবরাও রাজি হয়ে গিয়েছে। যদি স্কার্ফগুলো ওখানকার মার্কেটে ভাল বিক্রি পায়, তাহলে মাসে লাখখানেক স্কার্ফের অর্ডার পাঠাবে, যতদিন ওদের ক্রেজ থাকে। তোমাকে ইনট্রোডিউস করিয়ে দিলাম সাহেবদের সঙ্গে লিয়াজঁ করবে বলে।

সাহেবরা তাদের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে চলে যেতেই এম.-ডি মুচকি হেসে বললেন, দ্যাখো যদি এটা ক্লিক করে যায়, তাহলে দু'জনে একবার স্টেটস্ থেকে ঘুরে আসা যাবে।

রূপম অবাক হচ্ছিল ভীষণ। হঠাৎ এম. ডিঃ এতটাই বা কেন দরাজ হতে চাইছেন তার ওপর তা তার মাথায়ই ঢুকছিল না। এমন মুচকি হাসিও তাঁর মুখে এর আগে দেখেছে বলে মনে পড়ে না।

একরাশ ধন্দ নিয়ে নিজের চেম্বারে ফিরে এসে হাতের বকেয়া কাজগুলো দ্রুত সেরে নিচ্ছিল। বুঝি একটু অন্যমনস্কও ছিল, হঠাৎই চমক ভাঙলো টেলিফোনের আওয়াজ শুনে, রিসিভার তুলতেই শুনল, অরুণিমার গলা, শুনছ, টিটোর বাস এখনও আসেনি।

—আসেনি! দ্রুত হাতের কব্জিতে চোখ রাখতেই রূপম দেখল, চারটে পঁয়ত্রিশ বাজে। সাধারণত চারটে-সোয়া চারটের মধ্যেই টিটোর স্কুল বাস পেঁছে যায় ওদের বাড়ির সামনের রাস্তায়। চারটে কুড়ি পঁচিশ হয়ে গেলেই অরুণিমার টেনশন শুরু হয়ে যায়। এরকম টেলিফোন মাঝমধ্যেই করে সে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার জানায়, শুনছ, টিটোর বাস এক্ষুণি এল। আজও তেমনিভাবে অরুণিমার টেনশন কাটাতে বলল, আর একটু ওয়েট করো, এসে যাবে নিশ্চয়। না হয় টিলাদের বাড়ি একবার ফোন করে দেখো।

—করেছিলাম, টিলাও ফেরেনি এখনও।

—তাহলে নিশ্চয় কোনও কারণে আটকে গেছে গাড়ি। চিন্তা কোরো না বেশি। আমি আধঘণ্টার মধ্যে বেরোচ্ছি—

আধঘণ্টা পর আবার টেলিফোন করল অরুণিমা, শুনছ, এখনও টিটোদের বাস আসেনি। রূপম এবার সত্যিই তটস্থ হয়ে উঠল, সে কি! পাঁচটায়ও বাস এল না? বলো কী?

৬

টিটোর স্কুলবাস না আসা পর্যন্ত প্রতিদিনই অরুণিমা এভাবেই আনচান করতে থাকে। সাড়ে চারটে, চারটে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত তবু নিজেকে ঠেকিয়ে রাখে, কলকাতার পথঘাটের যা অবস্থা, এত জ্যাম-জট, ভিড়ভাট্টা যে পনের কুড়ি মিনিট কি বড়জোর আধঘণ্টা পর্যন্ত সহ্য করা যায়. কিন্তু তার পর থেকেই সে ঘর-বার করতে থাকে। তাদের ফ্ল্যাটবাড়ির ব্যালকনি থেকেই রাস্তাটা অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায় বলে সে আর নীচে গিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়ায় না। ব্যালকনি থেকেই স্কুলবাসটার গাঢ় নীলরঙের ভোঁতা মুখখানা দেখতে পেলেই সে তরতরিয়ে নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে। তারপর রাস্তার মোড়ে পৌঁছতে-পৌঁছতেই এসে দাঁড়ায় বাসটা। আজ চারটে পঁয়ত্রিশ, পৌনে পাঁচটা পার হয়ে ঘড়ির কাঁটা পাঁচটা ছুঁতেই তার মনে হল দম বন্ধ হয়ে আসছে সঙ্গে সঙ্গে টিলাদের বাড়ি আর একবার রিং করল, হ্যালো—

বার পাঁচ-ছয় ওদিকে আওয়াজ হওয়ার পরও যখন কেউ ধরল না তার মানে ওদের বাড়ির সবাইই খুব ব্যস্ত হয়ে নেমে গেছে রাস্তায়। শুধু টিলার মা প্রত্যাশাই নয়, ওর ঠাকুমা-পিসিও নিশ্চয় চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ফোন নামিয়ে রেখে অরুণিমাও এবার ছুটল রাস্তার দিকে। আরও দু-একবার এমনি দেরি হয়েছিল টিটোদের গাড়ি ফিরতে। একবার রাষ্ট্রপতির কনভয় যাবে বলে সব গাড়ি ঘোড়া আধঘণ্টা ধরে আটকে দিয়েছিল পুলিশ। আর একবার ওদের গাড়িটা এক দুর্ঘটনায় পড়ে। একটা টানা রিকশকে বাঁচাতে গিয়ে ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে ধাক্কা মেরেছিল বাসটা। তাতে বেশ কয়েকটি ছেলের ঠোঁট-মুখ কেটে গিয়েছিল, একজনের জিভও। সে কথা স্মরণ হতেই অরুণিমা আরও ছটফট করে উঠল। রূপমকে সেই কখন ফোন করেছে, তবু এখনও অফিস ছেড়ে বাড়ি ফিরছে না দেখে মনে মনে ভীষণ রাগ ধরছিল তার। একবার অফিস

গেলে আর বাড়ির কথা মনে থাকে না। একটু আগে আবার ফোন করেছে, তাতেও বাবুর হুঁশ ফিরল কি না কে জানে। এদিকে অরুণিমা যে চোখে অন্ধকার দেখছে—

রাস্তার মোড়ে পৌঁছে যখন রূপমের উপর তার মনের ঝাল ঝাড়ছে, ঠিক সেইমুহূর্তে তার চোখে পড়ল দূরের ক্রশিং পেরিয়ে দেখা দিয়েছে গাঢ় নীলরঙের বাসটা। নজরে পড়তেই নিজের অজান্তে স্বস্তির শ্বাস বেরিয়ে এল অরুণিমার। যাক্, তাহলে কোনও দুর্ঘটনা নয়। ক্রশিং পেরিয়ে বাসটা প্রথমে থামে সাদা দোতলা বাড়িটার কাছে, ওখানে অন্তরীপ নামে, তারপর বাস সোজা চলে আসে তাদের ফ্ল্যাটের কাছে। এদিকে মাত্র দুজনের জন্যই বাসটা আসে রোজ! তারপর বেরিয়ে যায় রাসবিহারী মোড়ের দিকে।

টিটো নামতেই উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল অরুণিমা, কী ব্যাপার কৈলাসদা, এত দেরি। ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল যে—

কৈলাস এ গাড়ির কেয়ারটেকার-কাম—কণ্ডাকটর. সে হাতের খৈনি ডলতে ডলতে হাসল, খুব গড়বড় হয়ে গেছে বৌদি। টিটোর কাছে সব শুনবেন।

বাসটা হুস করে চলে যেতেই বিস্মিত হয়ে টিটোর দিকে তাকাল অরুণিমা। এতক্ষণ খেয়াল করেনি, এখন নজর করল, টিটোর ফর্সা মুখখানা কেমন ভয়ত্রস্ত, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। দেখে তার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। বাড়িতে ফেরা পর্যন্ত আর তর সইল না, সন্ত্রস্ত গলায় বলে উঠল, কী হয়েছে রে, টিটো।

টিটো তার ভারী স্কুলব্যাগ ওয়াটার বটল্ তার মায়ের হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, জানো মা, ক্লাস এইটের রজতশুভ্রকে পাওয়া যাচ্ছে না—

—পাওয়া যাচ্ছে না! অরুণিমার বুকের ভেতর ছাঁত করে ওঠে, সে কি রে। কেন?

—ও জল খেতে বাইরে গিয়েছিল, আর ফেরেনি। ওদের আজ মান্থলি টেস্ট ছিল, সেই সময়—

—জল খেতে বাইরে গিয়েছিল মানে? জল তো তোদের স্কুলের সব ফ্লোরেই ড্রামে ভরা থাকে। ট্যাপ থেকেও তো খেতে পারে।

—সে তো লাইনের জল। ও নাকি বরাবর স্কুল কম্পাউন্ডের বাইরে ডীপ-টিউবওয়েল থেকে জল খেয়ে আসে। পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার একঘন্টা পরে বেরিয়েছিল, আর ফেরেনি।

অরুণিমা ভুরু কুঁচকে বলল, তাহলে নিশ্চয় পরীক্ষা ভালো হচ্ছিল না, হয়তো তাইই—। আজকালকার ছেলেরা যা হয়েছে—

—না মা, টিটো সজোরে মাথা ঝাঁকালো, ও সেকেণ্ড বয়, পড়াশুনোয় খুব ভালো। ওদের ক্লাস টিচার ওর খাতা দেখে বলেছেন, দারুণ পরীক্ষা দিয়েছে একঘণ্টা। নিশ্চিত হায়েস্ট মার্কস পেত।

—তাহলে ফিরল না কেন।

—তাই নিয়েই তো এতক্ষণ তোলপাড় চলছিল স্কুলে। বাড়িতে ফোন করে জানা গেল, বাড়িতেও যায় নি।

—রাতে নিশ্চয় ফিরে আসবে 'খন। নিশ্চয় কোনও একটা কারণ আছে।

—না মা, খোঁজখবর নিয়ে আমাদের হেডমাস্টারমশাই জেনেছেন দুটো লোক ওর সঙ্গে কথা বলছিল। তারাই নাকি একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে ওকে। ওদের বাড়িতে টেলিফোন করতে ওর মা ছুটতে ছুটতে এসেছেন পাগলের মতো—

খবরটা শুনে বেশ কিছুক্ষণ আতঙ্কে হিম হয়ে রইল অরুণিমা। তার রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই রূপম এসে পৌঁছল, তাকে দেখেই অরুণিমা প্রায় হামলে পড়ল তার ওপর, তোমার আর অফিস শেষ হয় না। কতক্ষণ ধরে তোমাকে বাড়ি আসার জন্য বলছি—

সব শুনেটুনে রূপমও অবাক হল কম নয়। তবু সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে বলল, কাল ইস্কুলে গেলে নিশ্চয় খবর পেয়ে যাবে রাতে বাড়ি ফিরেছে—

কিন্তু পরদিন টিটো স্কুল থেকে যে ভয়ংকর খবর নিয়ে ফিরল, তাতে শুধু অরুণিমাই প্যানিক হয়ে পড়ল তা নয়, রূপমও বিস্মিত, আতঙ্কিত। সেদিন সকালে রজতশুভ্রকে নাকি পাওয়া

গেছে কলকাতার অপরপ্রান্তে মুচিপাড়া থানা এলাকায়। মুখে গ্যাঁজলা তুলে সে পড়ে ছিল রাস্তার ধারে সংজ্ঞাহীন। তাকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে আশেপাশের লোকজন খবরটা পৌঁছে দেয় থানায়। পুলিশ তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে ক্রমে জ্ঞান ফেরে তার। কিন্তু তার কথাবার্তা তখনও এলোমেলো, অসংলগ্ন। কোনও ক্রমে নামধাম জেনে তার বাড়িতে খবর পৌঁছে দিয়েছে। পরে দেখা গেছে তার হাতে সুঁইয়ের দাগ। সম্ভবত তার শরীর থেকে রক্ত বার করে নেওয়া হয়েছে।

শুনে অরুণিমা আঁতকে উঠে বলল, আমি আর ছেলেকে স্কুলে পাঠাব না।

রূপম বলল, দু একদিন বন্ধ থাক বরং। আগে পরিস্থিতি কী হয় দ্যাখো। ব্লাড-সাকারদের একটা র‍্যাকেট আছে নাকি কলকাতায়।

রক্তচোষাদের ভয়ে অরুণিমা যখন সিঁটিয়ে আছে, সেসময় এক-দিন সকালে তার কাছে হাজির হল আর এক বিস্ময়। ট্যুর থেকে ফিরে আসা রূপমের ছাড়া প্যান্ট-জামা কাচতে দিতে গিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে আবিষ্কার করল একটি ছোট্ট মোড়ক, মোড়ক খুলে দেখল সোনার আংটি একটা, তাতে উৎকীর্ণ করা একটি নামের আদ্যাক্ষর—'এস'। আংটিটা বারদুই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে সে নিয়ে গেল রূপমের কাছে, এটা কার?

রূপম ঠিক বিস্মিত হল না, বরং অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আরে, এটা আমার পকেটেই রয়ে গেছে দেখছি।

—কার আংটি এটা?

—ওটা, রূপম দ্রুত যেন কিছু মনে করার চেষ্টা করল, ওটা সন্তোষবাবুর। সেই যে জামসেদপুরে গিয়েছিলাম, সন্তোষ জয়-সোয়াল নামে আমাদের এক ক্লায়েন্ট আমার বাথরুমে স্নান করে নিলেন, বাথরুমে যাওয়ার আগে হাত থেকে আংটিটা খুলে টেবিলে রেখেছিলেন, স্নানের আগে রোজই নাকি আংটি খুলে রাখা ওঁর অভ্যাস, কবে একবার স্নান করার সময় সাবান মাখতে গিয়ে আংটি খুলে হারিয়ে গিয়েছিল, তাইই—। তারপর কখন বেরিয়ে

পড়েছি দু'জনে, উনি পরতে ভুলে গিয়েছিলেন। সেদিন হোটেলে ফিরে ওটা দেখে ওঁকে টেলিফোন করতেই উনি বললেন, আপনার কাছে রেখে দিন, বিকেলে স্টেশনে সি-অফ করার সময় নিয়ে নেব। কিন্তু বিকেলে আর আসতে পারেননি স্টেশনে। আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম এ ক'দিন।

অরুণিমা আর একবার নেড়েচেড়ে দেখল আংটিটা, কিন্তু এ তো মেয়েদের আংটি।

রূপম বিব্রত হল কিছুটা, কাঁচুমাচু হেসে বলল, তা সন্তোষবাবু যদি মেয়েদের আংটি পরেন তো আমি কী করব?

অরুণিমা কিছুক্ষণ ভুরুতে কোঁচ ফেলে থাকল, তারপর মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে বলল, দ্যাখো, সন্তোষবাবু তোমাদের ক্লায়েণ্ট যখন, তখন হয়তো আংটি দিয়ে তোমাকে ঘুষ দিতে চাইছে। ঘুষ দেওয়ার এও হয়তো এক নতুন পদ্ধতি—

রূপম বেশ একটু কুঁকড়ে গেল স্বভাবতই। অরুণিমা যে ঘুষ নামক আধুনিক এই মারণাস্ত্রটিকে ভীষণ অপছন্দ করে তা রূপম হাড়ে-হাড়ে জানে। সে হেসে ম্যানেজ করার ভঙ্গিতে বলল, তাতে খুব সুবিধে হবে না। রূপম রায়কে আমাদের কোম্পানির এ টু জেড্ লোকজন সবাইই ভয় পায়। আমি আজই ক্যুরিয়ার সার্ভিসে ওটা ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছি। যদি কোন মতলবও থাকে, ফেরত পেলেই বুঝে যাবে--

আংটিটা মোড়কে পুনর্বার ভরে অরুণিমা রেখে দিল রূপমের সামনে, নাও, তোমার সম্পত্তি ধরো। বলে পায়ে ধুপধাপ শব্দ তুলে কিচেনের ভেতর ঢুকে গিয়ে বুঝিয়ে দিল, ব্যাপারটা তার খুবই অপছন্দের।

দিন দু'য়েক টিটোকে আর স্কুলে পাঠাল না অরুণিমা। স্কুল বাস রোজ সময়মতো তাদের স্টপেজে এসে যাচ্ছে দেখে খুবই কষ্ট হচ্ছে, তার তবু বুকের কাঁপুনিটুকু যাচ্ছে না যেন। তৃতীয় দিন সকালে ফোন করল টিলার মা প্রত্যাশা, কী হল দিদি, টিটোর শরীর খারাপ নাকি?

অরুণিমা হাসল, না, না—

—তাহলে স্কুলে যাচ্ছে না যে বড়ো।

—আসলে বেশ একটু ভয় পেয়ে গিয়েছি। ওই যে ব্লাড-সাকারদের গল্প শুনে—

প্রত্যাশাও হাসল, সে আমিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু টিলার বাবা খোঁজখবর নিয়েছেন ভালো করে। ব্লাড সাকারদের গল্পটা ঠিক নয়। অন্য কোনও একটা মিস্ট্রি আছে নাকি।

—তাই! অরুণিমা অবাক হল, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলও যেন, আমি তো ভয়েই মরে যাচ্ছিলাম। ঠিক আছে, তা হলে কাল থেকে আবার স্কুলে পাঠাব।

সেদিন সন্ধের পর রূপম বাড়ি এল বেশ খানিকটা দেরি করে। খুব চিন্তিত আর বিমর্ষ দেখাচ্ছিল তাকে, কেমন উসকখুসকও লাগছে যেন। অরুণিমা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, কী হল, শরীর খারাপ নাকি?

অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিল রূপম, নাহ্—

—তাহলে? কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।

—তাই? রূপম হাসার চেষ্টা করল, অফিসেরই ব্যাপার। মাঝেমধ্যে গণ্ডগোল তো হয়ই। সেরকমই—

—খুবই সিরিয়াস মনে হচ্ছে।

রূপম তার চোখমুখের বিচলিত অভিব্যক্তি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে, ছাড়ো ওসব, ভালো করে চা বানাও তো—

অরুণিমা তৎক্ষনাৎ অবিশ্বাস্য দ্রুততায় চা করে নিয়ে এল দু' কাপ। সেণ্টার টেবিলের দু'পাশে দু'জনে সোফায় বসে প্রতিদিন-কার মতো চায়ে চুমুক দিতে শুরু করে। অন্য দিন অরুণিমাই হুড়মুড় করে তার সারাদিনের রোজনামচা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শোনাতে বসে রূপমকে! আজ রূপমই হঠাৎ চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, বহরমপুর থেকে একটা ট্রাঙ্ককল এসেছিল অফিসে—

সবে চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকিয়েছিল অরুণিমা, আজ একটু বেশিই গরম ছিল চা-টা, রূপমের কথায় একসঙ্গে অনেকখানি চা

জিবে পড়তেই জিবটা পুড়ে গেল, কাপ নামিয়ে নিয়ে বলল, কার ফোন ? শৌভিকের ?

—হ্যাঁ, বলছিল, দাদা, খুব জরুরি দরকার আছে, একবার আসতে পারবে ?

অরুণিমা শক্ত হয়ে গেল মুহূর্তে, কিসের জরুরি ?

—বলছিল, বাবা নাকি পি. এফের টাকা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন —

অরুণিমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল যেন, সে কি !

—হুঁ, কিন্তু লাইনটা তারপর কেটে গেল।

অরুণিমা পাথরের মতো শক্ত করল মুখটা, তারপর মুখখানা বাঁকিয়ে ফেলল বিদ্রূপ মাখিয়ে, বাঃ, চমৎকার তোমার বাবাখানি !

রূপম্ কোনও কথা বলল না, চুপচাপ চায়ের কাপে ঠোঁটে ছোঁয়াতে থাকে। ঘরের আবহাওয়া হঠাৎ থম্ হয়ে যায় কী এক অনিবার্য টেনশনে লীন হয়ে। টিটো কিছু একটা বলতে এসেছিল তার মায়ের কাছে। অরুণিমা অহেতুক চিৎকার করে থামিয়ে দিল তাকে, যাও এখন। পড়তে বসো গিয়ে

টিটো বুঝে ফেলল মা আর বাবার মধ্যে কিছু একটা প্রব্লেম হয়েছে। এমন প্রায়ই হয়, তখন সে আর মায়ের ধারে কাছে ঘেঁসে না।

সে চলে যেতেই অরুণিমা গলায় উষ্মা মিশিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বহরমপুরে কোনও চিঠি দিয়েছিলে ?

—না। দেব-দেব ভাবছি, তারপর এমন সব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম। এখন মনে হচ্ছে, একবার ঘুরে এলেই হতো—

অরুণিমা এমন বিস্ময়, ক্রোধ চোখে নিয়ে তাকাল যেন রূপম কথাটা বলে দারুণ অপরাধ করেছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, বহরমপুর গিয়ে কি তোমার মা ভাই বোনকে আদর করে কলকাতায় ডেকে নিয়ে আসবে ঠিক করেছ !

রূপম ক্ষীণ প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল, না, তা নয়, কিন্তু একবার না গেলে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।

অরুণিমা একটু থমকাল, বুঝতে চেষ্টা করল রূপমের কথা,

তারপর রায় দিল, গেলে আরও জটিল হয়ে উঠবে এই বলে রাখলাম।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ আর একটা ফোন এল তাদের ফ্ল্যাটে। রূপম তখন বাথরুমে, দ্রুত এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল অরুণিমাই, হ্যালো—। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোত্থেকে বলছেন? ঝাড়গ্রাম থেকে ট্রাঙ্ক-কল! হ্যাঁ, বাড়ি আছেন। কী বললেন, ঝাড়গ্রাম হসপিটাল থেকে? ডক্টর দণ্ডপাট বলবেন? সায়ন্তনীর ব্যাপারে?

ততক্ষণে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে রূপম। অরুণিমার শেষ কথাগুলো তার কানে যেতেই সে দ্রুত গিয়ে প্রায় কেড়ে নিল রিসিভারটা, বলল, হ্যালো, রূপম রায় বলছি, কে, ডক্টর দণ্ডপাট? রিলিজ করতে হবে? আমাকেই? কেন, নিজেই তো চলে যেতে পারে। যাবে না বলছে? কী মুশকিল—

আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ওদিককার টেলিফোন-বার্তা মন দিয়ে শুনল রূপম, তারপর চিন্তিত গলায়, 'ঠিক আছে দেখছি' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখতেই তার চোখ পড়ে গেল বিস্মিত, অবাক-চোখে তাকিয়ে থাকা অরুণিমার দিকে। অরুণিমা তৎক্ষণাৎ বলল, সায়ন্তনী কে?

রূপম থতমত খেল, একটু যেন সময় নিল বলতে, তারপর বলল, ওই যে, জামসেদপুরের সেই ক্লায়েন্টের এক আত্মীয়া।

—তার ব্যাপারে তোমাকে ফোন করে জানাচ্ছে কেন?

রূপম নিজেকে গোছানোর চেষ্টা করল, আসলে ভদ্রমহিলাকে আমার সঙ্গেই সেদিন ট্রেনে তুলে দিয়েছিলেন মি. জয়সোয়াল। মহিলা ঝাড়গ্রামে নেমে গিয়েছিলেন। হঠাৎ কী কারণে যেন ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে!

অরুণিমা বিস্মিত হয়ে বলল, কিন্তু সে ঘটনার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?

—ভদ্রমহিলাকে একটা কার্ড দিয়েছিলাম আলাপ হওয়ার পর। তাঁর ব্যাগে সেই কার্ডটা ছিল। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ভদ্রমহিলা এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যে নিজের সম্পর্কে কিচ্ছু বলতে পারছেন

না। তাই তার ব্যাগ খুঁজে আমার কার্ডটা পেয়েছে বলে আমাকে ফোন করছে।

হতবাক হয়ে গেল অরুণিমা। বেশ অনেকক্ষণ থম্ হয়ে থেকে সমস্ত ব্যাপারটা মেলানোর চেষ্টা করল, তারপর বলল, বাহ্, ব্যাগে কার্ড পেয়েছে বলেই তোমাকে তার সঙ্গে জড়াচ্ছে!

'জড়াচ্ছে' শব্দটা কেমন ঠং করে কানে বাজল রূপমের। বলে উঠল, না, না, জড়াবে কেন! কোনও উপায় না পেয়েই এখন মহিলার ঠিকানার হদিশ করছে।

রূপমের কথাবার্তা, তার মুখের পাংশুভাব, থতমত অভিব্যক্তি দেখে কী যেন বুঝল অরুণিমা। রূপমের দিকে কড়াচোখে তাকিয়ে সরে এল সেখান থেকে। সরে এল বটে, কিন্তু তার ভুরুতে একটা সংশয়ের ছাপ লেগে রইল সারাক্ষণ। রাতে খেতে বসে, এমনকি বিছানায় শুয়েও রূপম যে একটা অস্বস্তিতে রয়েছে তা চোখ এড়াল না তার।

পরদিন অফিস থেকে ফিরে এসে চায়ের টেবিলে এটা-সেটা আলোচনার পর হঠাৎ রূপম বলল, ভোরে উঠে ট্যুরে যেতে হবে।

অরুণিমা চমকে উঠে বলল, কোথায়?

খানিক ইতস্তত করে রূপম বলল, বক্রেশ্বর, তসরের একটা বড অর্ডার এসেছে জাপান থেকে। ওখানে তাঁতিপাড়া বলে একটা গ্রাম আছে, প্রায় হাজারদশেক পরিবার ওখানে শুধু তসর বোনে ওদের ওখানেই যাব—

অরুণিমা বেশ নিখুঁত করে জরিপ করল রূপমের মুখ, তার-পর বলল, বক্রেশ্বর যাবে, না ঝাড়গ্রাম?

রূপমের চোখে অস্বস্তি ঘনিয়ে এল, নিজেকে সামলে নিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই অরুণিমা একইরকম মেজাজে কাটা-কাটা কণ্ঠস্বরে বলল, সায়ন্তনীর আংটিটা ফেরত দিয়ে এসো—

ভীষণ একটা ভাঙচুর হচ্ছিল রূপমের ভেতর। অরুণিমার চোখে স্পষ্টতই অবিশ্বাস আর সন্দেহ কুরে কুরে খাচ্ছিল তাকে। সেও আর অরুণিমার চোখে চোখ রাখতে পারছিল না। সে কখনই মিথ্যে বলে না এমনই জানত অরুণিমা। অথচ দু'দিন বাইরে

কাটিয়ে এসে ডাহা মিথ্যেগুলো কী অবলীলায় অরুণিমাকে সে বলেছে, তা অরুণিমার সামনে প্রকাশ হতেই লজ্জায়, অপমানে কুঁকড়ে গেল। কে সায়ন্তনী, তার সঙ্গে সায়ন্তনীর কী সম্পর্ক কিছুই জিজ্ঞাসা করল না সে। সেটাই আরও ভয়ংকর মনে হল রূপমের কাছে। পর মুহূর্তে মনে হল, সব কথা খুলে বলবে অরুণিমাকে। কিন্তু একজন ধর্ষিতা মেয়ের জন্য সে কেন এতখানি করতে গেল তা বললে কি বিশ্বাস করবে অরুণিমা।

নিজের মধ্যে চুরমার হতে হতে রূপম বুঝে উঠতে পারছিল না, আবার ঝাড়গ্রাম যেতে হবে কেন তাকে। যে পরিচ্ছেদ সেদিনই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, আবারও কেন জড়াতে যাবে তার মধ্যে। অথচ ডাঃ দণ্ডপাট ফোনে বললেন, 'মেয়েটি জ্ঞান হওয়ার পর নাকি বলছে, যিনি আমাকে সেদিন বাঁচিয়েছেন, তাঁকে একটিবার দেখতে চাই।'

৭

ভোর ছ'টা দশের ইস্পাত এক্সপ্রেস ধরে রূপম যখন ঝাড়গ্রাম সরকারি হাসপাতালে পৌঁছিল, তখনও শাল-সেগুনে ঢাকা সবুজ শহরটির গায়ে শীতের উম্‌সুম্‌ মোড়ক। ঘুমভাঙা ঝাড়গ্রামের মানুষ তখন চায়ের দোকানে, বাজারে, দোকান-পাটে ভিড় জমিয়ে শুরু করেছে রোজনামচার আর একটি পৃষ্ঠা। ট্রেন থেকে নেমে ঝক্‌ঝকে একটি রিক্সায় চড়ে হাসপাতাল কম্পাউণ্ডে পৌঁছিতেই রূপম এক ধরণের শিরশিরাণি অনুভব করল তার শরীরে।

ডাঃ দণ্ডপাট অবশ্য ততক্ষণে এসে বসেছেন তাঁর চেম্বারে, দ্রুতহাতে সইসাবুদে ব্যস্ত ছিলেন টেবিলে স্তূপীকৃত হয়ে থাকা অজস্র কাগজপত্র, রেজিস্টার ও অন্যান্য নথিতে। রূপমকে দেখেই যেন স্বস্তির শ্বাস বেরোল তাঁর গলায়, যাক, আপনি এসে পড়েছেন। খুব ভাবনায় ছিলাম ক'দিন।

বলেই ঘণ্টি বাজিয়ে ডাকলেন চেম্বারের বাইরে টুলের উপর অপেক্ষারত কোনও আর্দালিকে। রোগা, সিড়িঙ্গে, কালোপানা একটি লোক ঢুকতেই তাকে বললেন, এই বাবুকে ওপরের কেবিনে নিয়ে যাও তো, একলব্য। তারপর রূপমকে বললেন, পরশু থেকেই আপনার পেশেণ্ট একদম ফিট। তাই বেড থেকে সরিয়ে ওপরে একটা কেবিন ফাঁকা ছিল সেখানে শিফ্‌ট্‌ করে দিয়েছি। আপনি ততক্ষণে সায়ন্তনীর সঙ্গে কথা বলুন। আমি হাতের কাজগুলো সেরে আসছি।

সিড়িঙ্গে লোকটির পিছু পিছু সিঁড়ি ভেঙে, করিডোর পার হয়ে রূপম কেবিনের ভিতর ঢুকতেই ওদিকে একলব্য অদৃশ্য। হঠাৎ একটি অপরিচিত পরিবেশে এক অপরিচিতার মুখোমুখি হয়ে একটু আড়ষ্ট বোধ করল রূপম। হাসপাতালের কেবিন সাধারণত যেমন হয়, ততটা নোংরা নয়। তবু এটি ফ্যাকাসে চেহারার

অনতিবড় একটি ঘর, তার ভেতর আধফর্সা চাদর-পাতা স্টিল-ফ্রেমের ছোট কট একখানা, তার পাশে ছোট হোয়াট-নট, সেটাও স্টিল-ফ্রেমের। কিন্তু রূপমের 'পেশেণ্ট' তখন সেই কট্‌টিতে নেই। সে তখন কেবিনের দক্ষিণের জানালা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। বোধহয় বাইরের পৃথিবী দেখছিল উদাসীন, বিষণ্ণ চোখে। রূপমের পায়ের শব্দ পেতেই সে ঝটিতি সরে দাঁড়াল রূপমকে দেখে কিছুটা সন্ত্রস্ত কিছু বিস্ময়ও তার চাউনিতে।

বূপমও কম অবাক হয়নি। যে তরুণীটিকে সে-রাতে উস্ক-খুস্ক, বিপর্যস্ত চেহারায় দেখেছিল, সংজ্ঞাহীন অবস্থায়, সে এখন সদ্যস্নাত, ঝকঝকে শরীরে দাঁড়িয়ে। স্নানের পর মেয়েদের শরীরে একটা অন্যরকম সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। তাতে আরও রূপসী দেখাচ্ছে সায়ন্তনীকে। ঘন নীল শাড়িতে ওতপ্রোত হয়ে থাকা সায়ন্তনী নামের তার প্রায়-অপরিচিতা তরুণীটিকে নিজের পরিচয় দিল, আমার নাম রূপম রায়—

তাকে এর আগে দ্যাখেনি সায়ন্তনী, কিন্তু এ ক'দিনে নিশ্চয়ই ডঃ দন্ডপাটের কাছে তার নাম শুনে থাকবে। তাই দ্রুত তাব মুখের সন্ত্রাস, বিস্ময় ইত্যাদি অভিব্যক্তি মিলিয়ে ফুটে উঠল অন্য এক ধরণের চাউনি। তাতে বিস্ময়ের এক অন্যরূপ। তার সঙ্গে মিশে আছে সমীহ, আর হ্যাঁ, অভিমানও। অস্ফুটকন্ঠে বলল, ও, আপনিই—

আপনি বলবে, না কি তুমি, এমন ভাবতে ভাবতে রূপম বলে ফেলল, ডঃ দন্ডপাটের কাছে শুনলাম, এখন ভালই আছেন।

সায়ন্তনী সে কথা শুনল কি শুনল না, হঠাৎ তার দিক থেকে ফিরিয়ে নিল চোখ, বলে উঠল, আপনি সেই পরোপকারী? এহেন প্রশ্নের কী উত্তর হতে পারে তা ভেবে পেল না রূপম। তার উত্তর পাওয়ার আগেই সায়ন্তনী পরের প্রশ্নে চলে গেল, কী দরকার ছিল আপনার, আমাকে বাঁচানোর?

নিজেকে সামলে নেওয়ার জন্য একটু সময় নিল রূপম, তারপর বলল, যে অবস্থায় আপনাকে ট্রেনের মধ্যে দেখেছিলাম, তাতে যে কেউই তুলে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করার কথাই ভাবত—

সায়ন্তনী অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল, রূপমের জবাবে ঝট করে ফিরে তাকাল ফের, বাঁচালেনই যদি, তাহলে এখন কোথায় যাব তাও ঠিক করে দিতে হবে আপনাকে।

আমাকে! কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না রূপম। বোধহয় এ ধরনের কোনও আক্রমণের মুখোমুখি হতে হবে তাও অনুমান করতে পারেনি। সেদিন টেলিফোনে ডঃ দণ্ডপাট শুধু বলেছিলেন, যেহেতু আপনিই সই করে ভর্তি করেছিলেন, পেশেণ্ট আপনাকেই রিলিজ করে নিতে হবে। সেদিনও রূপম বলেছিল, 'আমাকেই!' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সে প্রস্তাব তবু গ্রহণযোগ্য ছিল, সরকারি হাসপাতালের নিয়মকানুন হয়তো এমনই, তাই অরুণিমাকে মিথ্যে কথা বলে ভোর-ভোর এসে হাজির হয়েছে এতদূরে। কিন্তু এখন, সায়ন্তনীর মুখোমুখি হয়ে আরও এক গভীরতর ঝামেলার সম্মুখীন হল। তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে, তার চোখের কিছু একটা ভাষা পড়ে ফেলে রূপম উল্টোদিকের কোর্টে বল ছুঁড়ে দিল, কেন, যে আস্তানা থেকে এসে সেদিন ট্রেনে উঠেছিলেন সেখানেই তো ফেরা উচিত।

—সেখানে ফেরার উপায় নেই বলেই তো প্রশ্নটা আপনার কাছে রেখেছি।

রূপমের কপালে ভাঁজ পড়ল। ট্রেনের ঘটনাটা সায়ন্তনীর জীবনে যদিও একটা বীভৎসে ক্ষতচিহ্নের মতো, তবু তা নিয়ে জানাজানিও হয়নি তেমন। পুলিশ এসে প্রাথমিক ইনভেস্টিগেশন করে গেছে ঠিকই, কিন্তু পুলিশ সূত্রে পাওয়া সংবাদ উধৃত করে সংবাদপত্রে একলাইন খবরও বেরোয়নি। সেক্ষেত্রে একটি তরুণীর পক্ষে যত অস্বস্তিকরই হোক, বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবাই স্বাভাবিক। একটু ভেবে সে কথাই বলল রূপম, আপনার বাড়ি কি জামসেদপুরেই?

সায়ন্তনী একটু রুক্ষ গলায় উত্তর দিল, যেখানেই হোক, আমি সেখানে আর কোনও দিন ফিরে যেতে পারব না।

রূপম আশ্চর্য হয়ে বলল, কিন্তু কেন?

—নিশ্চয়ই তার কারণ আছে।

—ও, রূপম কিছুক্ষণ থম হয়ে রইল, তারপর তার অজানিতেই যেন বেরিয়ে গেল মুখ থেকে, তাহলে ?

সায়ন্তনীও বোধহয় সেই কথাই ভাবছে। ভাবছে, আর দিশে-হারা হয়ে আছে তার জ্ঞান ফেরা ইস্তক। রূপমের অস্ফুট প্রশ্নে সে তৎক্ষণাৎ ঝনঝন করে উঠল, সে-কথা জানার জন্যই তো আপনাকে আসতে বলা হয়েছে এখানে। একটি মেয়ের দুর্দশা দেখে তখন তো খুব দয়া উথলে উঠেছিল প্রাণে, এখন সে কোথায় থাকবে সে প্রশ্নের জবাবও দিয়ে যেতে হবে। নইলে—

বলতে বলতে হঠাৎ থরথর করে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল তার, বলল, নইলে এ ধরণের মেয়েদের ভবিতব্য যা হয়, তাই-ই করতে হবে আমাকে।'

রূপম চমকে উঠল। সায়ন্তনীর দু'চোখে তখন অভিমান, হতাশা। তার সঙ্গে ক্রোধ মিলমিশ হয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছে। তার কাটাকাটা চোখমুখে অভিব্যক্তি বড় বেশি ধারালো, বড় বেশি বাঙ্ময়। সে যত কথা বলে, তার বহু গুণ কথা ফুটে ওঠে তার চাউনিতে।

বেশ ফাঁপরেও পড়ে গেল রূপম। সে ভেবেছিল, হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে সায়ন্তনীকে পেঁাছে দেবে তার বাড়িতে। দরকার হলে তার অভিভাবকদের বুঝিয়ে বলবে কিছু একটা বানিয়ে টানিয়ে। কিন্তু বাড়ি ফেরার প্রশ্নে সায়ন্তনী একেবারেই নারাজ। শুনে হঠাৎ উপলব্ধি করল, সে বোধহয় আরও বড় একটা ঝড়ের সম্মুখীন। একটু বেশিরকম দায়িত্ব যেন চেপে বসছে তার কাঁধে।

তবু সায়ন্তনীকে আবারও বোঝাতে চাইল, বেশি সেণ্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছ তুমি। জীবনে এমন কত কিছুই তো ঘটে মানুষের, তাতে কারও কোনও হাত থাকে না। বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার নতুনভাবে জীবন শুরু করতে হবে তোমাকে। পৃথিবীতে আরও বহু মেয়ের জীবনে এর চেয়ে অনেক বীভৎস ঘটনা ঘটেছে—, এই প্রথম সায়ন্তনীকে তুমি বলল সে।

সায়ন্তনী হঠাৎ রুক্ষস্বরে বাধা দিয়ে বলল, আপনি কি আমাকে নিতান্ত নাবালিকা ভেবে এত কথা বলে যাচ্ছেন ?

রূপম ক্ষুব্ধ হল, তুমি যে সাবালিকা তা বোঝার মতো আমার বয়স হয়েছে। তবু এত বড় বিপদে পড়লে বুদ্ধিমান মানুষদেরও ডিসিশন নিতে ভুল হয়ে যায়—

সান্তয়নী প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলল, আপনি আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। জানেন না বলেই এতসব অবান্তর কথা বলে যাচ্ছেন। আমার আর কোথাও ফেরার জায়গা নেই। এখন যা কিছু ভাবনা সব আপনাকেই ভাবতে হবে।

ক্রমশ অবাক হচ্ছে রূপম। সায়ন্তনী যা বলছে তা মানা তার পক্ষে অসম্ভব। এই বয়সের একটি যুবতী মেয়েকে নিয়ে এখন সে কোথায় যাবে, কী করবে, কেনই বা করতে যাবে। একটি ধর্ষিতা যুবতীকে অচেতন অবস্থায় ট্রেনের কামরা থেকে তুলে এনে হাসপাতালে ভর্তি করে বাঁচিয়েছে বলেই কি তার বাকি জীবনের সব দায়দায়িত্ব নিতে হবে তাকেই! সায়ন্তনীর মুখের দিকে স্পষ্ট করে তাকাল সে। যে সুন্দর মুখটি সে-রাতে যন্ত্রণায় নীল হয়ে ছিল, এখন তাতে ঘোর অনুযোগ। অনুযোগ এই কারণেই যে, সে এখন অসহায়। তার অসহায়তা ঢাকতে তাই এক অন্যায় দাবিতে বিপর্যস্ত করে তুলেছে রূপমকে!

কেবিনের ভেতর সেই মুহূর্তে এসে ঢুকলেন ডঃ দণ্ডপাট, হেসে বললেন, রিলিজের সব ব্যবস্থা করে এলাম মিঃ রায়, এখন আপনি সই করলেই—

কথা অসমাপ্ত রেখে পরক্ষণেই বললেন, বরং এ বেলাটা বিশ্রাম নিন, আমার কোয়ার্টারে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিয়ে ও বেলা নিয়ে যাবেন আপনার পেশেন্টকে।

হাসপাতালের পেশেন্ট সুস্থ হলে তাকে নিকটবর্তী আত্মীয়-পরিজনের হাতে তুলে দিলেই হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ খালাস। সেভাবেই কথা বললেন ডঃ দণ্ডপাট। সেই সঙ্গে রূপমকে এমন গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য তাঁর কোয়ার্টারে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে কিছু মানবতার পরিচয়ও দিলেন। কিন্তু রূপমের তাতে বিন্দুমাত্র সুরাহা হল না।

তারপর সত্যিই সায়ন্তনীর মতো একটি ভাবনার পাহাড়কে

সঙ্গে নিয়ে সে জামসেদপুরের দিকে নয়, দুটো সাতান্নর হাতিয়া-এক্সপ্রেস ধরে কলকাতার পথেই রওনা দিল। ডঃ দণ্ডপাট নিজে স্টেশনে এসে তুলে দিয়ে গেলেন ট্রেনে। রূপম তখনও স্তব্ধ। হাওড়া পর্যন্ত সাড়ে তিনঘন্টার জার্নিতে ভাল করে কথাই বলতে পারল না সায়ন্তনীর সঙ্গে। তাকে নিয়ে কোথায় যাবে, কার কাছে রাখবে এই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে উঠছিল বারবার। নিজের বাড়িতে নিয়ে তুললে হয়তো অজ্ঞানই হয়ে যাবে অরুণিমা। সম্ভাব্য এমন কোনও জায়গা তার জানা নেই যেখানে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে এই যুবতীকে।
হাওড়ায় পৌঁছে প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে আরও একবার সায়ন্তনীর কাছে সেই প্রশ্নই রাখল, কলকাতায় কোনও আত্মীয় নেই, আপাতত কয়েকদিন থাকা যায় এমন ?

সায়ন্তনী গম্ভীর হয়ে ছিল এতখানি পথ। হয়তো সেও ভেবে তোলপাড় হচ্ছিল হঠাৎ এই অপরিচিত মানুষটার সঙ্গে এসে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে এর পর ? রূপমের প্রশ্নে ঘাড় নাড়ল, না—

রূপম খড়কুটো খুঁজছিল। অন্তত কয়েকদিন কোনও একটা আস্তানায় থাকার ব্যবস্থা করতে পারলে সে বিষয়টি নিয়ে ভাববার সময় পাবে। সায়ন্তনীর বাড়ি সম্পর্কে একটি কথাও আদায় করতে পারেনি এই ক'ঘণ্টার মধ্যে। তার কিছুটা হদিসও বার করতে পারলে একবার নিজেই সেখানে গিয়ে খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করত। কিংবা এও হতে পারে, সায়ন্তনী ক'দিন পর নিজেই ফিরে যেতে চাইবে বাড়িতে। তার মানসিক শক্ কাটিয়ে উঠতে পারলেই হয়তো—

রূপমের দ্বিধা, অস্থিরতা ক্রমশ সঞ্চারিত হচ্ছিল সায়ন্তনীর মনেও। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যখন বাইরে পৃথিবীতে পা দিচ্ছে, সামনের হাওড়া-ব্রীজ, দূরে গঙ্গার প্রবহমান দৃশ্য, তার আপাতশান্ত জলরাশি দেখে প্রায় স্বগতোক্তির মতোই বিড়বিড় করল, বরং এবার আমাকে ছেড়ে দিন, হাওড়া-ব্রিজ থেকে শূন্যে ভাসিয়ে দিই নিজেকে। তাহলে আমার জন্য আপনার এত টানা-পোড়েন হয় না—

রূপম চমকে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সেণ্টু এগিয়ে এসে তাকে ধরল, স্যার, গাড়ি এ পাশে রেখেছি।

—গাড়ি। রূপম হঠাৎ টাল খেয়ে গেল। তার মনেই ছিল না ইস্পাত এক্সপ্রেস ধরার সময় সেণ্টুকে বলে গিয়েছিল, সন্ধের সময় তাকে নিতে আসতে। কখন ফিরতে পারবে তা জানত না, তাই বলেছিল, রাত হতে পারে, তবু সন্ধে থেকেই স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা কোরো। তখন ভাবতেই পারেনি, সায়ন্তনীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরতে হবে। এখন সায়ন্তনীকে দেখে সেণ্টুর ভুরুতেও সামান্য চিন্তার ছাপ, তার সাহেবের সঙ্গে যে যুবতীকে দেখতে পেল, কোনও আত্মীয়াই হবে হয়তো এমন ভাবল। নিশ্চয়ই, তবু রূপম আড়ষ্ট হয়ে গেল মুহূর্তে। সায়ন্তনীকে নিয়ে গাড়িতে উঠে কিছু না ভেবেই বলল, শ্যামবাজার—

অর্থাৎ কলকাতার যে তল্লাটে থাকে রূপম, তার ঠিক বিপরীত মেরুতে সেঁধুতে চাইল। চাইল এই কারণে যে, ভাববার জন্য তার এখন কিছুটা সময়ের দরকার। বাড়ি ফেরার আগে সায়ন্তনীকে কোথায় জিম্মা দিয়ে যাবে তার একটা হদিশ বার করতেই হবে।

সেই মুহূর্তে সায়ন্তনী তাকে কিছুটা আলোর সংকেত দিল, নর্থে আমার এক বান্ধবী থাকত, ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে—

—সে কোথায়? রূপম লাফিয়ে উঠতে চাইল।

—শ্যামবাজারের কাছেই। বছর দুয়েক আগে একবার এসেছিলাম তার কাছে। অনেকদিন কোনও যোগাযোগ নেই। সেখানে আছে কি না এখন তাও জানি না। বাগবাজারেই মনে হচ্ছে।

—তা হলে একবার খোঁজ নিই, বলেই রূপম সেণ্টুকে নির্দেশ দিল, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ ধরো—

এক অস্থির ভাবনায় ক্রমশ তোলপাড় হচ্ছিল রূপম। হঠাৎ কী এক বিশাল দায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল, কেনই বা হল, সে কেন-ই বা ঘাড় পেতে নিল, তার কিছুই মগজে সেঁধুল না তার। এই দায় কি সত্যিই তার ছিল? অনায়াসেই সে এড়িয়ে যেতে পারত ঝাড়গ্রামের টেলিফোন বার্তাটি। একটি ধর্ষিতা তরুণীকে সে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিল, এইটুকুই যথেষ্ট তার

পক্ষে। তারপরেও সে একদিন থেকে গিয়েছিল মেয়েটির জীবন-সংশয় ছিল বলে, কী হয় না হয় এই ভেবে। তারপর মেয়েটি যখন সুস্থ হয়ে উঠেছে, তখন তার বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তার পরেও তার দায়িত্ব রূপমকে নিতে হবে কেন! না নিলে কী-ই বা হতো। সায়ন্তনী যে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছিল সুইসাইড করবে বলে, সে জন্যেই কি—

যতটা জ্যামজট থাকে উত্তর কলকাতার পথঘাটগুলোতে, সে তুলনায় আশ্চর্য ফাঁকাই ছিল আজ। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ বরাবর হু-হু করে গিয়ে, এখানে ওখানে কিছুটা জিজ্ঞাসা করে তিনতলা সাদা হোস্টেলটা খুঁজে বার করল রূপম।

আরও কপাল ভাল যে, সায়ন্তনীর বান্ধবী পায়েল তার ঘরেই ছিল। মনে হল একটু আগেই অফিস থেকে ফিরেছে সে, বেশ-বাস বদলে সবে চিরুনিতে চুল আঁচড়াচ্ছিল, হঠাৎ সায়ন্তনীকে দেখে লাফিয়ে উঠল প্রথমে, তারপর কী যেন মনে পড়তে ভুরুটা কুঁচকে উঠল, তুই হঠাৎ? বাড়ি থেকে এলি?

সায়ন্তনী কিছুটা বিব্রত বোধ করছিল। কী বলবে যেন বুঝে উঠতে পারছিল না. একটু থমকে গিয়ে বলল, পরে সব বলবখন তোকে।

পায়েল তবু আশ্বস্ত হল না, বলল, দিন সাতেক আগে চিংকুদা ফোন করেছিল, তুই আমার এখানে এসেছিলি কি না?

সায়ন্তনী দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল. ঠিক আছে, পরে সব শুনিস—

রূপম একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল, পায়লের কথা ও সায়ন্তনীর প্রতিক্রিয়া দুইই তার কাছে অদ্ভুত ঠেকছিল। যেন কিছু একটা জানতে চাইছে পায়েল, আর তা সযত্নে গোপন রাখতে চাইছে সায়ন্তনী। 'দিন সাতেক আগে' শব্দগুলিই হঠাৎ ধন্দে ফেলে দিল রূপমকে। সাতদিন আগে তো নয়, দিন চার পাঁচ হল সায়ন্তনীকে সে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আবিষ্কার করেছিল ইস্পাত এক্সপ্রেসের কামরায়, তাহলে তারও আগে সায়ন্তনীর খোঁজ করেছিলেন চিংকুদা?

সায়ন্তনীকে দেখে যতটা অবাক হয়েছিল পায়েল, তার চেয়েও অবাক হল হঠাৎ বাইরে বারান্দায় অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়ানো রূপমকে দেখে। চমকে উঠে বলল, ইনি কে ?

--ইনিই আপাতত আমার পরিত্রাতা! বলে রূপমের দিকে তাকিয়ে সায়ন্তনী হাসতে চেষ্টা করল, বলল, এ-ই আমার বান্ধবী পায়েল।

রূপম হাত জোড করে নমস্কার জানাল, সায়ন্তনীকে বলল, বান্ধবীর সঙ্গে যখন দেখা হয়েই গেল, আমি চলি তাহলে—

সায়ন্তনী ঘাড় নাডল, যাবেন তো নিশ্চয়ই। আপনি অনেকক্ষণ থেকেই আমাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য উস্‌খুস করছেন, কিন্তু তাই বলে আমাকে এখানে একেবারে নির্বাসন দিয়ে যাবেন না, কাল কিংবা পরশু একটা খবর নেবেন।

শেষ কথাটা প্রায় আর্তনাদের মতো শোনাল। তাতে একটু বিচলিত হল রূপম। সায়ন্তনী সম্পর্কে সে এখনও একগলা অন্ধকারে, বরং এতক্ষণ যতটুকু রহস্য ছিল, পায়েলের কথা শুনে তা আরও ঘনীভূত হল। তবু হাসল, ঠিক আছে, এতক্ষণ যখন দায় বয়ে নিয়ে এসেছি, কিছু একটা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত না হয় আরও ক'দিন—

পায়েলও কপালে ভাঁজ ফেলে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ তার বান্ধবী সন্ধের পর এক অপরিচিত যুবকের সঙ্গে তার হোস্টেলে এসে হাজির হওয়ায় স্পষ্টতই সে বিব্রত। বিশেষ করে সে যখন সায়ন্তনীর পূর্ব ইতিহাস কিছুটা জানে রূপম বিদায় জানিয়ে যে মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াতে যাবে, তখন পায়েলই বলল, আপনার ফোন নম্বরটা বরং দিয়ে যান—

ফোন নম্বর! ঠিক আছে, লিখে নিন, বলে রূপম তার অফিসের নম্বরটাই দিল, টু ফোর টু...

পায়েল তার ডায়েরিতে নোট করে নিতেই রূপম দ্রুত নেমে এল হোস্টেল থেকে। সেণ্টু বাইরে অপেক্ষা করছিল গাড়ি নিয়ে। তাকে একা বেরুতে দেখে বোধহয় আশ্বস্ত হল। গাড়ি স্টার্ট দিতেই হঠাৎ খেয়াল হল রূপমের, সায়ন্তনী কিংবা পায়েল হয়তো

অফিসে ফোন করবে, কাল কিংবা পরশু। সে সবসময় অফিসে থাকে না, এখানে-সেখানে বেরিয়ে যেতে হয় ট্যুরে। তখন তাকে যদি ফোনে না পায়, হয়তো বাড়ির ফোন চাইবে, যেমন ঝাড়গ্রামের ডঃ দণ্ডপাট চেয়েছিলেন। হয়তো রূপম তখন বাড়িতে থাকবে না, ফোন ধরবে অরুণিমাই। তখন ?

সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে নিল রূপম, কাল অফিসে গিয়েই টেলিফোন অপারেটরকে বলে দিতে হবে, কেউ বাড়ির ফোন নম্বর চাইলে যেন না দেয়। কোন ক্রমেই নয়।

৮

জাপান কেলেঙ্কারির তদন্ত ঠিক কীভাবে করবে, কোন পদ্ধতিতে করলে দ্রুত এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে তা ভাবার চেষ্টা করছিল রূপম। সিল্ক-থানের যে স্যাম্পেল-কার্ড সে পাঠিয়েছিল জাপানি ইমপোর্টার ইয়াসুনারি নাকাচাবিকে, তার কাছ থেকে অর্ডার পাওয়ার পর অনুরূপ একটি স্যাম্পেল-কার্ড সে নিজের হাতে তুলে দিয়েছিল চিফ প্রকিওরমেন্ট ম্যানেজার অরিত্র চট্টরাজকে, আর একটি স্যাম্পেল-কার্ড রেখেছিল নিজের ড্রয়ারে। তার দেওয়া সেই স্যাম্পেল-কার্ডটি অরিত্র চট্টরাজ পাঠিয়েছিলেন রামপুরহাটের তাঁতিদের মহল্লায়। তার থেকে কয়েকটি টুকরো তাঁতিদের মধ্যে বিলি হওয়ার পর স্যাম্পেল-কার্ড চলে গেছে স্টোরে।

স্যাম্পেল অনুযায়ী পনের লক্ষ টাকার সিল্ক-থান এসে পৌঁছেছিল প্রকিওরমেন্ট সেকসনে। প্রকিওরমেন্ট দপ্তরের স্টোর-ইনচার্জ কদম বসাক ও তার স্টোরের কর্মীরা স্যাম্পেলের সঙ্গে ডেলিভারির মাল মিলিয়ে রিসিভ করেছিল গোডাউনে।

সেই সিল্ক-থান প্যাকিং হওয়ার পর প্যাকিং-এর দায়িত্বে থাকা কদম বসাক প্রতিটি প্যাকিং স্লিপে সই করেছে সিল্ক-এক্সপার্ট হিসেবে। তার ঠিক নীচেই প্রকিওরমেন্টের ডেপুটি ম্যানেজার বিনীথ শাসমলের সই। তার এপাশে চিফ প্রকিওরমেন্ট ম্যানেজার অরিত্র চট্টরাজ সই করেছেন। প্যাকিং-এর কাজ শেষ হওয়ার পর স্যাম্পেল-কার্ড চলে গিয়েছিল এক্সপোর্ট ম্যানেজার বর্নিল দত্তগুপ্তের টেবিলে। তাঁর দপ্তরের কর্মীরা যখন স্টোর থেকে মাল ডেলিভারি নিয়ে এয়ারপোর্টে পাঠাবার উদ্যোগ করছে, ঠিক সেসময় কীভাবে যেন খবরটা পৌঁছে গিয়েছিল চেয়ারম্যানের কানে।

আপাতদৃষ্টিতে এই কর্মকান্ডের পর যখন ধরা পড়ল, বেশ

খারাপ গুণমানের সিল্ক-থান প্যাকিং হয়েছে, তখন প্রাথমিক রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর যে তৎক্ষণাৎ সিল্ক-এক্সপার্ট কদম বসাককে সাসপেণ্ড করেছেন তা রূপমের মতে অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। কদম বসাক এতকাল ধরে সিল্ক নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। রেশমে হাত দিলেই তার গুণমান কত ডেনিয়েরের সব পলকে বুঝে যায়। তুঁতে আর তাঁত নিয়েই যে মানুষ হয়েছে জন্মাবধি, তার পক্ষে এবম্বিধ ভুল হওয়াটা অবশ্যই অপরাধ। আর এক-আধ শো টাকার তো ব্যাপার নয়, পনের লক্ষ টাকার রেশম।

কিন্তু এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। প্রথম প্রশ্ন, চিফ প্রকিওরমেণ্ট ম্যানেজার যে স্যাম্পেল্স পেঁাছে দিয়েছিলেন রামপুরহাটের বসোয়ায়, সেই স্যাম্পেল অনুযায়ী এরকম নিম্ন-মানের সিল্ক-থান কখনই তৈরি হতে পারে না। তাহলে চিফ প্রকিওরমেণ্ট ম্যানেজার নিজেই ভুল স্যাম্পেল পাঠিয়েছিলেন কি না। দ্বিতীয় প্রশ্ন, যদি তিনি ঠিক স্যাম্পেল পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে যাকে বসোয়া পাঠিয়েছিলেন, সেই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রকিওর-মেণ্ট ম্যানেজার সৌমিত জোয়ারদার স্যাম্পেল বদলে দিয়েছিল কি না। তৃতীয় প্রশ্ন, যদি সে ঠিক স্যাম্পেল দিয়ে থাকবে, তাহলে বসোয়ার তাঁতিরা এত লক্ষ টাকার নিম্নমানের থান তৈরি করল কেন? এরকম হতে পারে, কদম বসাকের সঙ্গে যোগসাজসে তারা এরকম থান একজোট হয়ে তৈরি করেছে, অথবা তাদের কাছে এরকম নিম্নমানের থান তৈরি হয়ে পড়ে ছিল, জি এম কলকাতা নেই জেনে কদম বসাকই তাদের টিপে দিয়েছে সেই অচল থানগুলো স্টোরে নিয়ে আসার জন্য। সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন থেকে যায়, অচল মালকে কদম বসাক 'ও কে' সার্টিফিকেট দিয়ে থাকলেও তার ওপরের দু-দু'জন অফিসার চোখ বুজে কদমের সইয়ের পাশে সই করল কেন? অন্তত ডেপুটি প্রকিওরমেণ্ট ম্যানেজার বিনীথ শাসমল তো বহুবার স্টোরে গিয়ে থান নিজের চোখে দেখেছে। সে তো রীতিমতো একজন ডিগ্রি-হোল্ডার। বয়সে তরুণ, তাকে কোম্পানি সিল্ক বিশেষজ্ঞ না বলুক, সিল্ক বিষয়ে সামান্যতম

অভিজ্ঞতা থাকলে যে কেউই ধরে ফেলতে পারে ব্যাপারটা। তা ছাড়া সিল্কের কোয়ালিটি যে খারাপ সেটা নিশ্চয় স্টোরের কারও মনে সন্দেহ জেগেছে। সন্দেহ জেগেছে বলেই সে খবরটা টুক করে পৌঁছে দিয়েছে চেয়ারম্যানের কানে। তাহলে স্টোরের সাধারণ কোনও কর্মীর মনে যদি সিল্কের গুণমান নিয়ে ধন্দ জেগে থাকে, তাহলে কদম বসাক কিংবা বিনীথ শাসমলের মনে তা জাগল না কেন? চতুর্থ প্রশ্ন হল, চিফ প্রকিওরমেণ্ট ম্যানেজার অরিত্র চট্টরাজ এই কোম্পানির প্রকিওরমেণ্টের ওভার অল ইনচার্জ। তিনি পনের লক্ষ টাকার সিল্ক-থান তাঁর স্টোরে ঢুকেছে জেনেও একবারও স্টোরে ঢুকে থানগুলো চোখের দেখাও দেখলেন না! পঞ্চম প্রশ্ন, এক্সপোর্ট ম্যানেজার বনিল দত্তগুপ্তও তো একবার দেখতে পারতেন থানগুলো। এত লক্ষ টাকার মাল এয়ারে জাপান যাচ্ছে, এক্সপোর্ট সংক্রান্ত নানা হ্যাঁপা তাঁকে সইতে হলেও যার জন্যে এত ছোটাছুটি, সেই প্যাকিং-এর ভেতর কী আছে না দেখে শুনে এয়ারে বুক করে দিলেই কি তাঁর দায়িত্ব শেষ?

এতসব কূট প্রশ্ন মনের ভেতর ঢালা উপুড় করতে করতে রূপম প্রায় জেরবার হয়ে গেল একা-একা। পনের লক্ষ টাকার মাল ডেলিভারির সঙ্গে এতজন অফিসার জড়িত। কেউই তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। তবু এতজন দায়িত্বশীল অফিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঠিক কে বা কারা এত টাকা ক্ষতির জন্য দায়ী, তা খুঁজে বার করা রীতিমতো কঠিন কাজ। কাজটা যথেষ্ট অস্বস্তিকরও। তারা সবাই একই অফিসে চাকরি করে, একই সঙ্গে ওঠা-বসা, আলোচনা করা, মিটিং করা, কখনও একই সঙ্গে ট্যুর করা, আবার কাজের ফাঁকে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গও আলোচনা হয় তাদের, সেই তাদেরই বিরুদ্ধে তদন্তের কাজ চালানো বেশ অসুবিধেজনক। অন্তত রূপমের পক্ষে। কিন্তু ম্যানেজিং ডিরেক্টরের আদেশ আর তা চেয়ারম্যানের অনুমোদন সাপেক্ষে যখন, কিছু করার নেই রূপমের।

চিফ প্রকিওরমেণ্ট ম্যানেজার অরিত্র চট্টরাজ ষাট অতিক্রান্ত এক দুঁদে অফিসার, কথাবার্তায় তুখোড়, স্মার্ট, আর বুদ্ধিমানও বটে।

খুব দ্রুত ও নিখুঁত পদ্ধতিতে যে কোন ধরনের প্রোডাক্ট সংগ্রহ করে দিতে পারেন কোম্পানির প্রয়োজনে। রামপুরহাটের বসোয়া, বক্রেশ্বরের তাঁতিপাড়া, বিষ্ণুপুরের সোনামুখী কিংবা মুর্শিদাবাদের সর্বত্র তাঁর চেনাজানা ও যাতায়াত। তাঁতিদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় এতটাই নিবিড় যে, তাঁর কোনও অনুরোধ কিংবা প্রস্তাব কোনটাই ফেলতে পারে না তারা।

অরিত্র চট্টরাজের সঙ্গে রূপমের খুবই হৃদ্যতা। রূপম এই কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার হলেও বয়স ও অভিজ্ঞতার জন্য সে অরিত্র চট্টরাজকে একটু সমীহই করে। কখনও ঠেকে গেলে ফনোকমের রিসিভারের তলে টুকটাক পরামর্শ নিয়ে থাকে তাঁর কাছ থেকে। সেই অরিত্র চট্টরাজের কাছ থেকে জানা গেল, তিনি রূপমের দেওয়া স্যাম্পেল-কার্ড যথারীতি তুলে দিয়েছিলেন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পার্চেজমেণ্ট অফিসার সৌমিত জোয়ারদারের কাছে সৌমিত অবশ্য বসোয়ায় একা যেতে একটু কিন্তু-কিন্তু করেছিল কিন্তু কোম্পানির খরচ বাঁচাতে চট্টরাজ সাহেবই তাকে বলেছিলেন, 'ইয়াং ম্যান, একা যেতে অসুবিধে কিসের। ট্রেনে উঠলেই দেখবে বন্ধু জুটে গেছে। ট্রেনে বন্ধুত্ব করার মধ্যে একটা আলাদা থ্রিল আছে। আর যদি বন্ধু নাও মেলে, তাহলে একটা ক্রাইম ফিকশন কিংবা থ্রিলার কিনে নিও হুইলারের স্টল থেকে. দেখবে সময় বয়ে যাচ্ছে হরিদ্বারের গঙ্গার মতো. হু হু করে।'

সৌমিত জোয়ারদার অনূর্ধ্ব তিরিশের যুবক, খুবই তড়বড় করে কথা বলে কাজে যত না এক্সপার্ট, কথায় তার চেয়ে বেশি একমাথা ঝাঁকড়া চুল দাড়ি রাখায় তার চেহারাটা দেখতে হয়েছে আঁতেলদের মতো। সৌমিত অবশ্য কথাবার্তায় প্রমাণ করার চেষ্টা করে সে খুবই প্রতিভাবান। রূপম তাকে চেম্বারে ডাকতেই সে এক নিঃশ্বাসে হুড়মুড় করে বলে গেল তার বসোয়াযাত্রার দীর্ঘ ধারাবিবরণী। সেইসঙ্গে তাঁতিদের মহল্লায় কার কার সঙ্গে কী কী কথাবার্তা হয়েছে, কীভাবে সে তাদের ছক কেটে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে কতদিনের মধ্যে কাকে কত সিল্ক-থান তৈরি করে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে সিল্ক-ট্রেডিং কোম্পানির স্টোরে। রূপমের

প্রশ্নের জবাবে সে অবশ্য জানাল, সিল্ক-থান স্টোরে আসার পর সে একদিনও মালগুলো দেখতে যায়নি। কারণ স্টোরে চেকিং-এর দায়িত্বে ছিলেন ডেপুটি প্রকিওরমেণ্ট অফিসার বিনীথ শাসমল। চট্টরাজ সাহেবের কাছ থেকে যে স্যাম্পেল-কার্ডটি সে পেয়েছিল, তার থেকে কয়েকটি টুকরো সে দিয়েও এসেছে বসোয়ার তাঁতদের মহল্লায়। তারপর ফিরে এসে যথারীতি স্যাম্পেল-কার্ডটি পাঠিয়ে দিয়েছে স্টোর ইনচার্জ কদম বসাকের কাছে, যাতে তারা থান রিসিভ করার সময় স্যাম্পেলের সঙ্গে থানের গুণমান মিলিয়ে নিতে পারে।

রূপম এরপর খবর নিল বিনীথ শাসমলকে। বিনীথ বোধহয় তিরিশের কিছুটা ওপারেই, কিন্তু সুদর্শন চেহারা, লম্বায় পাঁচ-আট হবে। প্যাণ্টের ভেতর শার্ট গুঁজে পরে বলে বেশ ব্যক্তিত্ববান মনে হয় তাকে। কিন্তু আসলে একটু লাজুক, আলাভোলাও বটে। কাজে কিছুটা শ্লথ বলে এইসব প্রাইভেট কোম্পানির কাজে সে বেমানান, চট করে দায়িত্বও নিতে চায় না। রূপমের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে জানাল, সিল্ক-থানগুলির গুণমান দেখে তার মনে অবশ্য এ প্রশ্ন উদয় হয়েছিল যে, এগুলো বোধহয় এক্সপোর্ট কোয়ালিটির নয়। কিন্তু কদম তাকে বলেছিল, ঠিকই আছে, সে স্যাম্পেলের সঙ্গে থান মিলিয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছে বলেই মাল রিসিভ করেছে।

এতক্ষণ তদন্তের পর রূপমের মুখে চিন্তার ছাপ পড়ে। ভুরু কুঁচকে বলল, কদম বসাক বলেছে স্যাম্পেলের সঙ্গে মিল আছে থানের?

বিনীথ ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, তাই তো বলল।

—আপনি দেখেছিলেন স্যাম্পেল কার্ডটা?

—না স্যার, দেখিনি। প্যাকিং হওয়ার পর কদম বলেছিল স্যাম্পেল-কার্ড তার কাছে নেই। সে দিয়েছিল ই. এম. সাহেবকে। চট্টরাজ সাহেব নাকি কী কারণে ই. এমের কাছ থেকে নিয়েছিলেন কার্ডটা। বোধহয় এক্সপোর্ট সেকশনে পাঠাবেন বলে। তারপর এম. ডি. কিংবা অন্য কেউ দেখতে চেয়েছিলেন বোধহয়।

তাই? রূপম কিছুক্ষণ চিন্তা করল ব্যাপারটা। একটু পরে

জিজ্ঞাসা করল, আপনি এম. ডি. কিংবা চট্টরাজ সাহেব কাউকে থানের কোয়ালিটি সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন ?

—না স্যার, বলিনি। বিনীথ শাসমলের সরল স্বীকারোক্তি, কারণ কদম বসাক যখন তার এক্সপার্টস ওপিনিয়ন দিয়েছে তখন জিজ্ঞাসা করার প্রশ্নই ওঠে না।

রূপম তীক্ষ্ণচোখে তাকাল বিনীথের মুখের দিকে। বিনীথ লেখাপড়ায় একসময় নাকি ভালই ছিল, ভেবেছিল ডাক্তার ইঞ্জিনীয়র বা অমন কিছু হবে। শেষ পর্যন্ত তাকে টেক্সটাইল নিয়ে পড়তে হওয়ায় সে খুবই অখুশি, তেমনই ফ্রাস্ট্রেটেড এই প্রাইভেট কোম্পানিতে ডেপুটি প্রকিওরমেণ্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে হওয়ায়। তার শেষ কথাটি সম্ভবত ব্যাঙ্গার্থেই বলেছে, যদিও এই মুহূর্তে তার মুখ বেশ নিরীহই দেখাচ্ছে।

এক্সপোর্ট ম্যানেজার বর্নিল দত্তগুপ্তকে খবর পাঠাল রূপম। বর্নিল প্রায় রূপমেরই বয়সী। তারও টেক্সটাইলের ডিগ্রি আছে, তার ওপর বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট পাশ করেছে সম্প্রতি। অন্য একটা ইয়ার্ন কোম্পানিতে কাজ করছিল ভাল মাইনেয়। কিন্তু কোম্পানি হঠাৎ তাকে কলকাতা থেকে গুজরাতে বদলি করায় বাধ্য হয়ে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। কারণ সে ভীষণ হোমসিক। তাই কলকাতার বাড়িঘর ছেড়ে কোথাও নড়তে চায় না। রূপমের চেম্বারে এসে অবশ্য স্বীকার করল, প্যাকিং-এর ভেতর কী মাল যাচ্ছে তা দেখা উচিত ছিল তার, কিন্তু সে সাধারণত নির্ভর করে চট্টরাজ সাহেবের ওপর। অভিজ্ঞ চট্টরাজসাহেব যে এবার তাঁর অধস্তনদের ওপর তদারকির ভার দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলেন তা একবারও বুঝতে পারেনি বর্নিল। জানতে পারলে অবশ্যই দেখে যেত থানের কোয়ালিটি। অবশ্য কদম বসাক তাকে একবার বলেছিল, মালটা ভাল না। তবে জাপানি ইমপোর্টার যখন এরকম খারাপ কোয়ালিটির মাল পছন্দ করে গেছে তখন কার আর কীই বা বলার আছে।

এবারও ভুরু কোঁচকাতে হল রূপমকে, কদম বসাক এই কথা বলেছে ?

ই· এম· বর্নিল দত্তগুপ্ত ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

—আপনি স্যাম্পেল-কার্ড দেখেছিলেন ?

—না স্যার, তবে কদম বসাক বলেছে বলে আর সন্দেহ করিনি।

রূপম হঠাৎ তার ড্রয়ার থেকে বার করল স্যাম্পেল-কার্ডের ডুপ্লিকেটটি। বলল, এই দেখুন, ই· এম সাহেব। কী ধরনের থানের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, আর কী কোয়ালিটির থান ঢুকেছে কোম্পানির স্টোরে।

বর্নিল দত্তগুপ্ত স্যাম্পেল-কার্ডটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলল অদ্ভুত ব্যাপার তো! এ তো টপ কোয়ালিটির সিল্ক। জাপানি ইমপোর্টার আপনাকে এই স্যাম্পেল দিয়ে গিয়েছিলেন, স্যার ?

—নিশ্চয়ই। জাপান এখন যাকে বলে উঠতি বড়লোকের দেশ। সেখানে সবই টপ কোয়ালিটির। তারা সাব-স্ট্যাণ্ডার্ড মালের অর্ডার দিয়ে যাবে তা ওরা ভাবলই বা কী করে।

বর্নিল দত্তগুপ্ত হঠাৎ আমতা আমতা করে বলল, কিন্তু স্যার, কদম বসাক কিন্তু সাসপেণ্ড হওয়ার পর আরও দু-একজনকে বলেছে, স্যাম্পেল-কার্ডে যেরকম কোয়ালিটির থান ছিল, ঠিক সেই কোয়ালিটির থানই ও রিসিভ করেছে। তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নয়।

রূপম একমুহূর্ত থমকে গেল, তারপর হেসে বলল, সাসপেণ্ড হওয়ার পর সবাইই তো নির্দোষ সাজতে চায়, তাই না দত্তগুপ্ত-সাহেব ? ঠিক আছে· তাহলে কদম বসাককেই জেরা করা যাক।

বর্নিল দত্তগুপ্ত চেম্বার ছেড়ে চলে যাওয়ার একটু পরেই কদম বসাক এসে ঢুকল রূপমের চেম্বারে। কদমের নামের সঙ্গে তার চুলের একটা মিল আছে। কালো, গুঁট ধরনের চেহারা কদমের, মাথার চুল নিগ্রোদের মতো ছোট করে ছাঁটা। গোল মাথাটা দেখায় প্রায় কদমফুলেরই মতো। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স কদমের, তার চেহারার মধ্যে একটা অহঙ্কার আছে। গাঁয়ের ছেলে একটু চালাক-চতুর হলে যেরকম অহঙ্কার ফুটে ওঠে কথাবার্তায়, অনেকটা সেরকই। সেই অহঙ্কার প্রায়শ ঔদ্ধত্য বলে মনে হয়। রূপমের

চেম্বারে ঢুকে সেই ঔদ্ধত্যই ফুটে বেরুল তার কথাবার্তায়, স্যার, আমার কোন দোষ নেই। যেরকম স্যাম্পেল আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেরকম কোয়ালিটির থানই দিয়ে গেছে তাঁতিরা।

রূপম ভেতরে ভেতরে আশ্চর্য হচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ ড্রয়ার থেকে বার করল ডুপ্লিকেট স্যাম্পেল-কার্ডটি, কদমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখুন তো, এরকম স্যাম্পেল-কার্ড আপনি পেয়েছিলেন কি না?'

কদম কিন্তু স্যাম্পেল-কার্ড দেখে চমকে উঠল। রূপমের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বলল, না স্যার, এ তো এক নম্বর মাল, আমাকে যে স্যাম্পেল-কার্ড দেওয়া হয়েছিল, তা দু'নম্বর মাল নয়।

রূপম একটু কড়া চোখে তাকাল কদম বসাকের দিকে, ভাল করে দেখুন তো সাম্পেলটা। এই একই স্যাম্পেল-কার্ড আমি সেদিন দিয়েছিলাম চট্টরাজসাহেবের হাতে। সেম কোয়ালিটি।

কদম প্রতিবাদ করে বলল, হতেই পারে না স্যার। হাফ-প্যান্টুল পরার বয়স থেকে সিল্ক নিয়ে ঘর করছি। বসোয়ার ছেলে সিল্ক চিনবে না তো কি কলকাতার লোক চিনবে?

তোমাকে যে স্যাম্পেল-কার্ড দিয়েছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সৌমিত জোয়ারদার, তার নিচে আমার সই ছিল?

কদম বসাক এতক্ষণ বেশ জোরগলায় কথা বলছিল, এবার সে থমকে নিয়ে বলল, তা তো খেয়াল করিনি, স্যার।

রূপম হঠাৎ ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল। কদম বসাক যে সত্যি-কথা বলছে না তাইই এতক্ষণ মনে হচ্ছিল তার। এখন প্রবল সন্দেহ উপস্থিত হল তার মনে, কোন পর্যায়ে স্যাম্পেল-কার্ডটা বদল হয়ে যায়নি তো! জি. এমের চেম্বারে এসে তদন্তের মুখোমুখি হয়েও কদম এমন দারুণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলছে দেখে স্যাম্পেল-কার্ডটি বদল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই মনে উদয় হল তার। যে কোন পর্যায়েই তো স্যাম্পেল বদল হওয়া সম্ভব। সৌমিত জোয়ারদার যে স্যাম্পেলের টুকরো দিয়ে এসেছিল তাঁতিদের মহল্লায়, সেটাই সম্ভবত খারাপ গুণমানের, নইলে সমস্ত তাঁতিই

একজোট হয়ে এমন বাজে সিল্ক থান তৈরি করতেই বা যাবে কেন? সিল্ক-থান যদি স্যাম্পেলের সঙ্গে মিল না হয় তাহলে তা অবশ্যই রিফিউজ্ড হবে স্টোরে।

কদম বসাককে বিদায় দেওয়ার পর দুটো ভাবনা ঘুরতে লাগল রূপমের মাথায়। প্রথমত, পুরো ব্যাপারটাই ঘটেছে কদম বসাকের ষড়যন্ত্রে। সে বসোয়ার ছেলে। সমস্ত তাঁতিদের সঙ্গেই তার চেনা-জানা, ওঠা-বসা। সে-ই গোপনে তাঁতিদের টিপে দিয়েছে খারাপ কোয়ালিটির থান তৈরি করে পাঠাতে সিল্ক-এক্সপার্ট হিসেবে। সে 'ও কে' করে দিলেই যখন মাল প্যাকিং হয়ে যাবে, তখন দ্রুত অন্য সকলের চোখে ফাঁকি দিয়ে কাজটা হাসিল করে ফেলবে। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল, কদমের কাছে যে স্যাম্পেল-কার্ড এসেছে, সেইটেই জাল স্যাম্পেল-কার্ড। হয়তো সৌমিত জোয়ারদারই বসোয়া গিয়ে খারাপ গুণমানের স্যাম্পেল দিয়ে এসেছে তারপর রূপমের দেওয়া স্যাম্পেল-কার্ডটি না দিয়ে অন্য কোনও স্যাম্পেল কার্ড দিয়েছে কদম বসাককে। সেক্ষেত্রে কদম বসাকের কিছু করার ছিল না। আর যেহেতু অফিসের সবাই জানত, রূপম রায় এই অমোঘ সময়ে কলকাতায় থাকবে না, অতএব ব্যাপারটা জানতে পারবে না কেউ। অর্থাৎ জেনারেল ম্যানেজারের অনুপস্থিতির সুযোগটাই নিতে চেয়েছে এরা।

ভাবনাটা দু-চারবার মাথায় চক্কর দিতেই রূমপের আবার মনে হল, সৌমিত জোয়ারদারের কি এতই সাহস হবে স্যাম্পেল বদলে দেওয়ার? না কি আরও ওপরের লেভেলে বদলাবদলির ব্যাপারটা হয়েছে!

তৎক্ষণাৎ সে খোঁজ করল, সেই বিতর্কিত স্যাম্পেল-কার্ডটির! এক্ষুনি একবার দেখা দরকার ওটা। তবে এখন হয়তো বদল হওয়ার ব্যাপারটা আর বোঝা যাবে না। রূপমের দেওয়া মূল স্যাম্পেল-কার্ডটি হয়তো বেরিয়ে আসবে তখন। তাতে সমস্ত দোষ শেষ পর্যন্ত কদম বসাকের ঘাড়ে গিয়েই পড়বে।

একটু আগেই বিনীথ শাসমল এসে বলে গিয়েছে, সেই স্যাম্পেল-কার্ডটি কদম বসাকের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন চিফ প্রকিওরমেণ্ট

ম্যানেজার চট্টরাজসাহেব। এম. ডি. অথবা আর কাউকে দেবেন বলে। তাহলে হয়তো চট্টরাজ সাহেবের কাছেই থাকা সম্ভব।

তৎক্ষণাৎ ফনোকমের বোতাম টিপে চট্টরাজ সাহেবকে ধরল রূপম। চট্টরাজসাহেব অবশ্য জানালেন, তাঁর কাছে স্যাম্পেল-কার্ডটি নেই। স্টোরে বিষয়টি নিয়ে যেদিন হৈ-চৈ হয়েছিল, চেয়ারম্যান সব দেখেশুনে এম ডি-কে বলেছিলেন সেই মুহূর্তে তদন্ত করতে, তখনই এম. ডি স্যাম্পেল-কার্ডটি চেয়েছিলেন চট্টরাজ-সাহেবের কাছে। চট্টরাজসাহেব সেদিনই ই. এম-এর কাছ থেকে স্যাম্পেল-কার্ডটি নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন এম. ডি-র কাছে। সেই থেকে এম. ডি-র কাছেই আছে ওটা।

খবরটি শোনার পর বেশ টেনশন হল রূপমের। স্যাম্পেল-কার্ডটি তাহলে যাঁর জিম্মায় আছে, সেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিরণ সান্যাল আপাতত কলকাতাতেই নেই। গতকাল ভোরে চলে গিয়েছেন লখনউ, সেখানে হ্যান্ডলুমের ওপর কী একটা সেমিনার হচ্ছে, তাতে পেপার পড়বেন সিল্ক ডেভেলপমেণ্টের ওপর। ফিরতে ফিরতে নাকি পরশু। অথবা আরও দু-একদিন দেরি হতে পারে, কারণ ট্রেনে ওঠার সময় ড্রাইভারকে নাকি বলে গিয়েছেন, হয়তো ওখান থেকে নৈনিতাল-কৌশানীও ঘুরে আসতে পারেন একঝলক।

অর্থাৎ সেই বিতর্কিত স্যাম্পেল-কার্ডটি আপাতত কয়েকদিন হাতে পাচ্ছে না রূপম। না পাওয়া পর্যন্ত তার তদন্তের কাজও এগুতে পারছে না এককদমও। কদম বসাকের সাসপেনশনও উঠছে না। স্যাম্পেল-কার্ডটি হাতে পেলেই রূপমের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে গোটা ব্যাপারটা। চিফ প্রকিওরমেণ্ট অফিসারের হাতে যখন সে স্যাম্পেল-কার্ডটি দিয়েছিল, তাতে সে সই করে রেখেছিল ঠিক এজন্যেই যাতে পরে কোনও গোলমাল না হয়। ভাগ্যিস সই করেছিল।

যাই হোক, সারাদিনে যতজনকে ইনটারোগেট করেছে তাদের কেউ না কেউ সত্যি কথাটা বলছে না। হয় কদম বসাক অথবা সৌমিত জোয়ারদার। না কি চিফ প্রকিওরমেণ্ট ম্যানেজার।

ভাবনাটা একলহমা তার মগজে ঘুরপাক খেতেই সহসা বিহ্বল

হয়ে গেল সে। অরিত্র চট্টরাজ খুবই পোড় খাওয়া, দুঁদে অফিসার। অবসর গ্রহণের পর ঝকঝকে একখানা অ্যাম্বাসাডার কিনেছেন, সেই গাড়িতেই যাতায়াত করেন অফিসে. তেলের খরচ অবশ্য কোম্পানিই দেয়। বিশাল তিনতলা বাড়ি করেছেন পাইকপাড়ায়। এ নিয়ে কোম্পানির স্টাফদের ভেতর কখনও ফিসফিসানি যে না হয় তা নয়, বোধহয় সে কানাকানির গুঞ্জন কোনভাবে চট্টরাজ সাহেবের কানেও পেঁাছে থাকবে, তাই একদিন রূপমের চেম্বারে বসে কথায় কথায় বললেন. পৈতৃক সম্পত্তি কি কম পেয়েছি কিছু ? শুধু ধানিজমিই ছিল দেড়শো বিঘে। সব বিক্রিটিক্রি করে দিলাম। সেই অরিত্র চট্টরাজ সম্পর্কে অবশ্য আরও নানান কানাঘুষো শোনা যায় প্রায়শ। এই ওয়ার্ল্ডওয়াইডে এসেও নাকি অনেক কিছু এদিক-ওদিক করেছেন। তিনি কি এবারও হঠাৎ এমন একটি চাল চেলে দিতে পারেন ? তাঁর সঙ্গে এম. ডি-র রিলেশন খুবই ভাল, কারণ এম. ডি. ও মনে করেন, চট্টরাজসাহেবের মতো একজন এক্সপার্ট কোনও কোম্পানিতে থাকা মানেই সেই কোম্পানির একটা ইমেজ তৈরি হয়, গুডউইলও বেড়ে যায় অনেক, সেই অরিত্র চট্টরাজ যদি এবার সত্যিই এতবড় একটা রিস্ক নিয়ে থাকেন, তো সেটা নিয়ে কোম্পানিতে প্রবল হৈ চৈ হবে নিশ্চয়।

হৈ চৈ-এর ধরনটা কতটা ভয়ংকর হবে ভেবে যখন মুষড়ে পড়ছে রূপম, সেই মুহূর্তে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল তার টেবিলে। রিসিভার তুলতেই শুনল ওদিকে কারুবাকী মিত্রের গলা, স্যার, কাল ফার্স্ট আওয়ারের দিকে কি আপনি ফ্রি আছেন ?

রূপমের চোখমুখ শক্ত হয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ রিসিভারে তার হাতের মুঠি আরও কঠিন হয়ে চেপে বসল যেন, না—

—স্যার, আমার কিছু বক্তব্য আছে. আপনাকে ডিটেইলসে সব বলা দরকার। মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিলেই হবে।

—স্যরি, মিস মিত্র. কাল ভীষণ ব্যস্ত থাকব।

—কাল, না হলে পরশু, না হলে তরশু!

রূপম আর কোনও কথা না বলে আস্তে করে রেখে দিল রিসিভারটা। একটু অভব্যতাই হয়ে গেল বোধহয়। কিন্তু এমন

নাছোড়বান্দার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী?

কারুবাকীর হাত থেকে নিস্তার পেল বটে, কিন্তু সেই মুহূর্তে তাব ভাবনা ঘিরে ধবল সায়ন্তনী। সায়ন্তনীর নিরাপদ আস্তানা মানে তার বাড়ি ফিরে যাওয়া। যে করেই হোক, তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পৌঁছে দিতে হবে বাড়িতে। সেদিন রূপমের হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও মুখে রা-টি কাড়েনি সায়ন্তনী। যেন তার অতীতকে সে প্রাণপণে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে, গোপন করতে চাইছে তার কোনও ইতিহাস। হয়তো তা ভুলের ইতিহাস বলেই।

তবে তার বান্ধবী পায়েলকে এখন সঙ্গে পাওয়া যাবে। তার সঙ্গে যৌথভাবে যদি বোঝানো যায় সায়ন্তনীকে. তাহলে হয়তো—

৯

যেদিন সন্ধেয় সায়ন্তনীকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর ওপর এই ওয়ার্কিং হোস্টেলে পৌঁছে দিয়েছিল, তার পর মাত্র দিন তিনেক কেটেছে, অথচ রূপমকে আজ সন্ধেয় দেখামাত্র পায়েল বলে উঠল, কী ব্যাপার, আপনার আসার সময় হল ?

রূপম স্বভাবতই বিব্রত বোধ করছিল, পায়েলের কথায় মনে হল তার যেন অনেক আগেই আসার কথা ছিল এখানে, পারলে সায়ন্তনীকে এখানে জমা দিয়ে যাওয়ার পরদিনই, আসেনি বলে রূপমকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইছে পায়েল।

সায়ন্তনী অবশ্য কোনও কথা বলেনি, তাকে যতটা অসহায়, চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় রেখে গিয়েছিল এখানে আজ তাকে দেখে মনে হল তার চেয়েও বিষণ্ণ, যেন তিনদিনে তিন বছর বয়স বেড়ে গিয়েছে। রূপমের দিকে তাকাচ্ছিল বড়-বড় চোখ করে, যেন তার অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু বলতে পারছে না, বলেও বা কী হবে এমন চোখ মুখের অভিব্যক্তি তার।

পায়েলের ঘর বেশ পরিষ্কার, ছিমছাম। দুজনে কষ্টেসৃষ্টে শোওয়া যায় এমন খাটের এপাশে ঘোরাফেরার মতো সামান্য জায়গা। তার মধ্যেই তার আলনা, আলমারি দুটো সিঙ্গল সোফা। তারই একটায় রূপম বসল। সায়ন্তনী একটু দূরে, বিছানার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে, নতমুখে। অভিমানিনীর মতোই লাগছে। পায়েল ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নতুন অতিথিটির জন্য চা বানাতে। স্টোভ জেবলে তার ওপর কেটলি বসাতে বসাতে বলল, সায়ন্তনীকে নিয়ে কিছু ভাবলেন ? খুব তো ঝামেলা বাধিয়ে বসেছে।

রূপম বুঝতে পারছিল না কী ঝামেলা। সে যে ঝামেলাটির কথা জানে, তার কথা পায়েলের কাছে বলেছে কি না সায়ন্তনী

বুঝতে পারল না। না কি সায়ন্তনী তারও আগে কোনও ঝামেলা বাধিয়েছিল, যা পায়েল জানে, কিন্তু রূপম জানে না, তারই কথা বলছে পায়েল !

জিজ্ঞাসু মুখে তাকাল রূপম। পায়েল আরও কিছু বলে কি না তার অপেক্ষায় রইল। ইস্পাত এক্সপ্রেসের ঘটনাটা পায়েলের কাছে হয়তো বলেনি সায়ন্তনী, না বলাই তো উচিত। কোনও মেয়েই বোধহয় বলতে পারে না। পায়েলের পরের কথা শুনে মনে হল বলেওনি। পায়েল বলল, আপনি বোধহয় শোনেননি ওর সব কথা। আমি সেদিন থেকে বলছি, জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা তুই করেছিস, এখনও বাড়ি যা, গিয়ে সব মিটিয়ে নে। কিন্তু কিছুতেই রাজি হচ্ছে না--

রূপম তখনও নিশ্চুপ থেকে বোঝার চেষ্টা করছে সায়ন্তনীর ভুলের রকম। কিছু একটা ভুল যে সে করেছে এবং ভালো করেই মাশুল দিতে হয়েছে তাকে সে ভুলের তা রূপম জানে। তবে ভুলটা নিশ্চয় তার মাশুলের চেয়ে বড় নয়। বস্তুত যে মাশুল দিতে হয়েছে সায়ন্তনীকে, তার চেয়ে বড়ো অভিশাপ নিশ্চয় মেয়েদের জীবনে আর নেই। তবু ভুলটা কী তা জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল রূপমের। পায়েল হয়তো বলতে চেয়েছিল তা, কিন্তু এতক্ষণ পরে সায়ন্তনী মুখ তুলল, রূপমের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কেনা দরকার। একবার মার্কেটে নিয়ে যাবেন আমাকে ?

রূপম একটু ফাঁপরে পড়ল। সায়ন্তনী, বলা যায়, একবস্ত্রে এসে উঠেছে পায়েলের হোস্টেলে, তার নিত্য ব্যবহার্য বহু জিনিষই এই মুহূর্তে দরকার। তবু কেন যে সে এই ক'দিনে সেগুলো না কিনে অপেক্ষা করছিল রূপমের জন্য তা বুঝতে পারছিল না। সেটা অবশ্য বুঝিয়ে দিল পায়েলই, বলল, আমি কাল বলেছিলাম, চল, আমি নিয়ে যাই তোকে, কিন্তু শুনল না, বলল, না, ও আসুক—

'ও আসুক' শব্দটা হঠাৎই কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল রূপমের কানে। সায়ন্তনীর সঙ্গে তার কী সূত্রে পরিচয়, কেনই বা, তা নিশ্চয় পায়েল জানে না। শব্দটা নিশ্চয় বিস্মিত করেছে পায়েলকে,

হয়তো পুলকিত, কারণ তার বলার ধরন দেখেই রূপম উপলব্ধি করে ফেলেছে মুহূর্তে।

সে একবার অবাক হয়ে তাকাল সায়ন্তনীর মুখের দিকে, সে মুখে কোনও ভাবান্তরই নেই যেন। ততক্ষণে চায়ের কাপ নিয়ে এসেছে পায়েল। রূপমের সামনে সেন্টার-টেবিলে রাখতে রাখতে চোরাহাসিতে ভরিয়ে ফেলল মুখ, বলল, এবার আপনি ম্যাও সামলান। যেমন ঘাড়ে নিয়েছেন—

চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়াতে যাচ্ছিল, পায়েলের কথা শুনে বেশ টালমাটাল হয়ে গেল রূপম। ব্যাপারটা এমন চকিতে ঘটে গেছে, আর তার ভেতর সে নাক গলাতে গিয়ে এখন তার ঘাড়ে এমন বিপুল বোঝা এসে হাজির হবে তা বুঝতে পারেনি তখন। বুঝতে পারলে হয়তো এমন ঝামেলার ভেতর ঢুকতে চাইত না। কিন্তু তার স্বভাবই এমন যে নিঃস্ব পর হলেও কেউ যদি তার কাছে সাহায্য চায় তো সে এগুবেই। যতখানি সম্ভব তাকে সাহায্য করবে। টাকা পয়সা দিয়ে হয়তো পারে না, কিন্তু তার যোগাযোগ, জানাশুনো দিয়ে অন্যের উপকার করাটাই তার ধাত, কিন্তু তার এবারের সাহায্য তাকে যে এমন বিচিত্র পরিস্থিতিতে উপনীত করবে তা কে জানত!

প্রায় নিঃশব্দে চায়ের কাপ শেষ করল রূপম। পায়েল বোধহয় তার এই অপ্রস্তুত অবস্থাটি বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। তার সম্পর্কে পায়েলের কাছে কী বলেছে সায়ন্তনী তা রূপম জানে না। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে সে তৎক্ষণাৎ তাকাল সায়ন্তনীর দিকে, তাহলে তৈরি হয়ে নাও। কী কেনাকাটা করতে হবে—

চুপচাপ তৈরি হয়ে সায়ন্তনী বেরিয়ে এল রূপমের সঙ্গে। নীচে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল সেন্টু। সায়ন্তনীকে দেখে সে একটু অবাকই হল। রূপম তাকে গম্ভীরভাবে বলল, হাতিবাগান মোড়ের দিকে চলো তো—

সেন্টু বড়রাস্তায় গাড়ি নিয়ে আসতেই রূপম তাকাল সায়ন্তনীর দিকে, এভাবে বান্ধবীর কাছে কতদিনই বা আর থাকা যাবে!

সায়ন্তনী চুপচাপ তাকিয়ে ছিল রাস্তার দিকে। সন্ধের পর

প্রায়ই জ্যামজট হয় এদিকটায়, বিশেষ করে মেট্রোরেলে খোঁড়াখুঁড়ির কল্যাণে রাস্তা কোথাও কোথাও এমনই অপরিসর যে চলতে চলতে প্রায়ই দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। যে পথ যেতে দশমিনিট লাগার কথা তা বোধহয় আধঘন্টা লেগে যাবে। সায়ন্তনী তার কথার কোনও জবাব দিল না দেখে রূপম আবার বলল, বান্ধবীর হোস্টেলেই কি পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থা হল নাকি?

এতক্ষণে জবাব দিল সায়ন্তনী. আর কোথাও থাকার জায়গা না পেলে আপাতত এখানেই—

—বাড়ি ফেরার ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নিলে না!

—বাড়ি ফিরব না বলে যখন একদিন বেরিয়ে পড়েছিলাম. তখন সেখানে ফেরার কোনও প্রশ্ন ওঠে না আর।

সায়ন্তনী তাহলে বাড়ি ফিরবে না বলেই বেরিয়ে পড়েছিল এটুকু এতদিনে জানতে পারল রূপম। কিন্তু কেন সেই সিদ্ধান্ত, সে কি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মতোই. সে সব তথ্য জানা যাচ্ছে না। নিশ্চয় আস্তে আস্তে জানা যাবে সব কথা। গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে ততক্ষণে, সামনে জ্যামজট। অতএব গলার স্বর খাদে নামাতে হল রূপমকে. হোস্টেলেও যখন পাকাপাকি থাকা যাবে না, তখন অন্য কোনও উপায় তো ভাবতে হবে।

সায়ন্তনী প্রায় ঝটিতি জবাব দিল, তাহলে সেটা আপনাকেই ভাবতে হবে।

—আমাকে! রূপমের গলায় যেন কফ আটকে গেল। পলকে একবার নজর পড়ল সামনের সিটের ওপরে আয়নাটার দিকে সেন্টু বেশ অবাক হয়ে এদিকে তাকিয়ে রয়েছে আয়নার ভেতর দিয়ে. নিশ্চয় কানও খাড়া করে রেখেছে তাদের কথোপকথনের দিকে। রূপমের চোখে চোখ পড়তেই চট করে সে চোখ ফিরিয়ে রাস্তার জ্যামজট দেখতে লাগল।

রূপম দীর্ঘক্ষণ নিরুত্তর রয়েছে দেখে সায়ন্তনী একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রূপমের দিকে, তারপর রুষ্টকণ্ঠে বলল, আমাকে নিয়ে খুব ভাবনায় পড়লেন মনে হচ্ছে!

—ভাবনার কথাই তো, রূপম এবার বলল, খুবই নিচুস্বরে,

হঠাৎ এই বয়সের একটা মেয়ে কেনই বা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, কেনই বা আর ফেরা যাবে না সেখানে, এসব না জেনে কোনও ভাবনাই ভাবা যায় না।

সায়ন্তনী একটু শক্ত হয়ে গেল, সব কথা নাও তো বলা যেতে পারে।

গাড়ি ততক্ষণে আবার চলতে শুরু করেছে। রূপম ক্রমশ ধন্দে পড়ছে। সায়ন্তনী কেন যে এমন ঘোলাটে হয়ে থাকতে চাইছে বুঝতে পারছে না। বারবার আড়াল করে রাখছে নিজেকে। অত-এব রূপমও শক্ত হল এবার, তুমি এতটা অবুঝ হচ্ছ কেন! হয়তো কোনও একটা ভুল করেছ জীবনে। সে ভুল আর সংশোধনের উপায় নেই তা আমার মনে হয় না। সমস্ত ঘটনা জানা দরকার।

সায়ন্তনী সম্বিত হারিয়ে ফেলল মুহূর্তে, ঠিক আছে, আপনা-কে কিছু ভাবতে হবে না, আমি কোনও একটা চাকরি জুটিয়ে নেব।

—চাকরি! রূপম অবাক হয়, এত সহজে কলকাতা শহরে চাকরি জোগাড় করে ফেলবে।

সায়ন্তনীর মুখচোখ এতক্ষণে প্রায় চনমনে হয়ে ওঠে, পায়েল জোগাড করে দেবে বলেছে।

—পায়েল কোত্থেকে চাকরি দেবে! ওদের অফিসে?

—পায়েল অফিসে চাকরি করে না।

—তা হলে?

সায়ন্তনী বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলল, ও পার্কস্ট্রিটের একটা রেস্তরাঁয় গান গায়।

—গান গায়! রেস্তরাঁয়? রূপম প্রায় ছিটকে উঠল যেন। সেন্টু বোধ হয় তার সে উত্তেজনা বুঝে ফেলেছে। গাড়ি চালাতে চালাতে তার দিকে একবার তাকাল আয়নার ভেতর দিয়ে।

সায়ন্তনী শক্ত হয়ে বলল, দরকার হলে ওই চাকরিই নেব। আপনাকে এ নিয়ে বেশি ভাবতে হবে না আর। গানের জন্যই যখন এত হেনস্থা, তখন গান গেয়েই তার মাশুল দিতে হবে।

তাহলে গানের জন্যই! সায়ন্তনী গান গাইতে পারে এ তথ্যও যেমন জানল রূপম, তেমনই বুঝল গান গাওয়ার সঙ্গে তার এই

দুরবস্থার যোগ আছে। কী যোগ তা জানে না, হয়তো এভাবে একটু একটু করে একদিন জানা যাবে, অথবা কখনও জানা যাবে না। তা নাই বা জানল রূপম, কিন্তু সায়ন্তনী তার রুজি-রোজগার-এর পন্থা হিসাবে যে কথা ভেবেছে, বলা যায় পায়েলই ঢুকিয়েছে, তা জেনে স্তম্ভিত হল। হয়তো এ ক'দিন ধরে দুজনে অনেক জল্পনা কল্পনা করে এহেন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। কিন্তু যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন, তা যে ভুল, কত বড় ভুল তা কি বুঝতে পারছে না সায়ন্তনী? না কি উপায় না পেয়ে পায়েলের পথই নিজের পথ বলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু পায়েল রেস্তরাঁয় গান গায়! গান গেয়ে তার জীবিকা অর্জন। রূপম তো জানত, যারা এ ধরনের রেস্তরাঁয় গান গায়, তারা ভাল মেয়ে হয় না। শুধু কি গান গায় পায়েল, না কি নাচেও? পায়েল ক্যাবারে গার্ল নয় তো! ভাবতেই রূপমের বুকের ভেতর রক্ত চলকে উঠল হঠাৎ। পায়েলকে দেখতে তত রূপসী না হলেও তার শরীরের গঠনটি চমৎকার। হয়তো নিয়মিত ব্যায়াম করে। এ সব মেয়েদের ফিগার ঠিকঠাক রাখতে নানান পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। তাহলে সায়ন্তনী শেষে কি একটা ক্যাবারে গার্লের কাছে এসে উঠেছে! ও কি জানে পায়েল গান গায়, অথবা নাচে! যদি নাও নাচে, তবু রেস্তরাঁয় যারা গান গায়, তারা শেষপর্যন্ত চরিত্র ঠিকঠাক বজায় রাখতে পারে? না রাখতে পারাই তো সম্ভব, কারণ পার্ক-স্ট্রিটের রেস্তরাঁ মানেই অবধারিত ভাবে বার। সেখানে যারা আসে তাদের একাংশে মাতাল হওয়ার পর নারী সাহচর্য চায়। রেস্তরাঁর মালিকরা এইসব গায়িকা কিংবা নাচিয়েদের ব্যবহার করে খদ্দেরের রুচি অনুযায়ি।

এমনতর নানা ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ রূপম খেয়াল করল, তারা হাতিবাগানে এসে পৌঁছেছে। সেন্টুকে কোনও সুবিধেমতো জায়গায় গাড়ি পার্ক করতে বলে সায়ন্তনীকে নিয়ে নেমে এল, আস্তে করে বলল, যা যা কেনার কিনে ফেল চট্ করে। কত টাকা লাগবে—

—টাকা লাগবে না, সায়ন্তনী শান্ত গলায় বলল।

রূপম অবাক হল, তোমার কাছে টাকা থাকার তো কথা নয়—

—পায়েলের কাছ থেকে নিয়েছি। ধার হিসাবে।

রূপম তাকাল সায়ন্তনীর দিকে, চারপাশে নিয়ন-আলোর চকমকির মধ্যে সায়ন্তনীর চোখেমুখে একটা শক্ত ভাব। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর নিশ্চয় তার জীবনে আরও অনেক দুর্বিপাক গিয়েছে। এত ঝড়ঝাপটের ভেতর যত পায়ের তলায় মাটি হারিয়ে ফেলছে, ততই খড়কুটো খুঁজছে চারপাশে হাত বাড়িয়ে। কোথাও হাত পিছলে গেলে অন্যত্র বাড়িয়ে দিচ্ছে তার কাঁপা-কাঁপা আঙুল।

সে রকমই শক্ত চোখমুখে প্রায় নিঃশব্দে সে কেনাকাটা করল এটা-ওটা। দৈনন্দিন ব্যবহার্য কিছু জিনিস, কিছু পোশাক-আসাক। নিশ্চয় আরও কিছুকাল তাকে এই অনিশ্চয়তার ভেতর কাটাতে হবে, এমন ভেবে নিয়েছে সায়ন্তনী। রূপম বুঝতে পারছিল না, কীভাবে সায়ন্তনীকে সঠিক গন্তব্যে নিয়ে যাবে। একবার ভুল করেছে বলে, চিরটা কাল তাকে একই ভুলপথে চলতে হবে, তার এই ভুল সিদ্ধান্তকে বদলানো দরকার।

কিন্তু ভুল পথটাই আপাতত ভবিতব্য এ কথা ভেবে নিয়েই বুঝি সায়ন্তনী ক্রমশ গম্ভীর, শক্ত হয়ে উঠছে। না কি—, সহসা ভাবল রূপম, হয়তো তার ভবিতব্য কী হতে পারে তা রূপমকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, জানাল, তার সামনে এখন তীব্র অন্ধকার। রূপমকেই বাঁচাতে হবে তাকে, আলোয় নিয়ে আসতে হবে, নইলে অন্ধকারের জগতে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। কিন্তু রূপম কী করতে পারে? সায়ন্তনী রূপমের সব কথা তো জানে না, বলতে গেলে রূপমকে চেনেই না ভাল করে। তবু, রূপম ভাবল, পায়েলকে যদি এড়াতে হয়, তাহলে রূপমই তার কাছে এই মুহূর্তে একমাত্র খড়কুটো।

মার্কেট থেকে বেরুবার মুখেই হঠাৎ কে যেন ডাকল রূপমকে, স্যার—

—স্যার! রূপম থামল এবং চমকালও। সামনে দাঁড়িয়ে তারই কোম্পানির এক অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার, ঋতপ্রভ চৌধুরী। সাতাশ আঠাশের মতো বয়স, বেশ হ্যাণ্ডসাম চেহারা, হাসি-হাসি মুখে বলল, স্যার, মার্কেটিং করতে এসেছেন?

রূপম একবার তাকাল সায়ন্তনীর দিকে, বিব্রতভাব কাটিয়ে উঠতে দ্রুত বলে ফেলল, হ্যাঁ, এ হল আমার পিসতুতো বোন সায়ন্তনী, রাউরকেল্লা থেকে এসেছে পরশু। তা আজ ওর জন্মদিন। তাই-ই কিছু কেনাকাটা।

—স্যার, চেতলা থেকে হাতিবাগান এসেছেন মার্কেটিং করতে' ঋতপ্রভর গলায় স্পষ্টতই বিস্ময়।

—না শুধু মার্কেটিং নয়, রূপম সামলে নিল দ্রুত, আসলে গানের অডিশন আছে ওর, রেডিওতে, সেইজন্যই এসেছে বিডন স্ট্রিটে। একজন গানের টিচার আছেন, তাঁর সঙ্গেই যোগাযোগ ওর, অডিশনে যাওয়ার আগে কিছু টিপ্স্ দেবেন বলেছিলেন, তাই-ই –

ঋতপ্রভ তৎক্ষণাৎ আগ্রহী হল, উনি গায়িকা নাকি ? বাহ্, কী গান করেন ? রবীন্দ্রসঙ্গীত ?

সায়ন্তনীর মুখ থেকে যেন রক্ত সরে গিয়েছিল, কেন তা বুঝতে পারল না রূপম, ঋতপ্রভর প্রশ্নে সহজ হওয়ার চেষ্টা করল, ঘাড় নাড়ল নিঃশব্দে, হ্যাঁ।

—ইস্ কী চমৎকার। আমি আবার রবীন্দ্রসঙ্গীতের দারুণ ভক্ত। যদি অনুমতি করেন, একদিন আপনার ফ্ল্যাটে যাই, স্যার, ওঁর গান শুনব। রাউরকেল্লায় থাকেন যখন, প্রবাসী বাঙালি। প্রবাসী বাঙালিরা সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপারে দারুণ আগ্রহী হয়। আমি এবার কানপুরে গিয়েই টের পেলাম। তা স্যার, কবে যাব, অবশ্য উনি যদি গান শোনাতে রাজি থাকেন—

রূপম প্রমাদ গুনল। একটু বেশি কথা বলে ঋতপ্রভ, নাছোড়ও বটে, কীভাবে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে বলল, ক'দিন পরে বলব, অডিশনটা হয়ে যাক, তারপর—

—ঠিক আছে, স্যার, আমি কিন্তু ছাড়ছি না। রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার জন্য আমি স্বর্গেও যেতে রাজি আছি। একদিন হুট করে আপনার ফ্ল্যাটেও –

ঋতপ্রভর নাগাল পেরিয়ে সায়ন্তনীকে নিয়ে গাড়িতে উঠল রূপম। উঠল বটে, কিন্তু কী একটা যেন কুট কুট করে কামড়াতে লাগল তার শরীরে। ঋতপ্রভ যদি সত্যিই তার ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হয়!

গিয়ে সায়ন্তনীকে খোঁজে! তাহলে কী যে একটা কাণ্ড ঘটাবে অরুণিমা তা ভাবতে গিয়ে অস্থির হয়ে পড়ল রূপম। কী করে ঋতপ্রভকে বারণ করা যাবে তা নিয়েই ঢালা-উপুড় করতে লাগল মনে মনে।

সায়ন্তনীর দু'হাতে অনেক কেনাকাটি, এত মার্কেটিঙের পর সাধারণত মন-মর্জি ভালই থাকে মেয়েদের। কিন্তু আরও চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে সায়ন্তনীকে। তেমনই অন্যমনস্কভাবে বলল, হঠাৎ অডিশনের কথা বললেন কেন?

রূপম তার মুখের দিকে তাকাল, বুঝতে চেষ্টা করল সায়ন্তনীকে, সে কিছু ভেবেচিন্তে বলেনি, হঠাৎ যা মাথায় এসেছে, বলে দিয়েছে ঋতপ্রভকে, কিন্তু তা নিয়ে সায়ন্তনী ভাবছেই বা কেন?

—পায়েল কিছু বলেছে আপনাকে?

—পায়েল, কই না তো, রূপম বুঝল সায়ন্তনীর জীবনের যে অংশটুকু সে জানে না, তা জানতে পেরেছে কি না পায়েলের কাছ থেকে সেটা নিঃসন্দেহ হতে চাইছে সায়ন্তনী। সেটা কেন লুকোতে চাইছে সায়ন্তনী, তা রূপম জানে না! এত গোপনীয়তাই বা কিসের! যেটুকু রূপম জানে তার চেয়েও কি সেই না-জানা অংশটুকু আরও ভয়ংকর!

সায়ন্তনী দ্রুত একবার তাকিয়ে দেখল রূপমের দিকে। গাড়ির মধ্যে অন্ধকারই বেশি, তাতে তেমনভাবে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তবু দু'ধারের রাস্তার আলো বিলি কেটে যাচ্ছে তাদের মুখে। কী দেখল সায়ন্তনী কে জানে, হঠাৎ বলল, পায়েলকে কি আপনি কিছু বলেছেন?

রূপম ঘাড় নাড়ল, না, পায়েলের সঙ্গে আমার তো সেই একদিন দেখা, তোমাকে যখন দিতে এসেছিলাম। কথা হবেই বা কী করে?

—তাহলে পায়েল বলল কেন, আমার আর সমাজে ফেরা হবে না? রেস্তরাঁয় গান গাওয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই!

কেন বলল পায়েল, তা রূপম জানবে কী করে! পায়েল যেটুকু জানে, সেটুকু ভেবেই হয়তো কথাটা বলেছে। হয়তো পায়েল চাইছে, সায়ন্তনীও তার মতো অন্ধকারের পথ বেছে নিক।

তা ছাড়া, সায়ন্তনী নিজেও তো বলেছে, তার আর ঘরে ফেরার পথ নেই।

—আপনি তাহলে পায়েলকে কিছু বলবেন না।

—নিশ্চয়ই নয়, রূপম আস্তে আস্তে বলল, তোমার কি ধারণা যে আমি সবাইকে বলব।

—তা নয়, তবে—, কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল সায়ন্তনী, কেননা সেণ্টু ততক্ষণে থামিয়ে ফেলেছে তার গাড়ি। কাছেই পায়েলদের হোস্টেল। রূপমের পিছু পিছু নেমে এল সায়ন্তনী, কিন্তু রূপম আর ভেতরে ঢুকতে চাইছিল না। সায়ন্তনীও অবশ্য জোর করল না। দু-এক পা এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, গভীর গলায় বলল, আপনি আবার কবে আসছেন?

রূপম কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না, বলল, দেখি—

—পায়েল আমাকে বার বার বলছে, ওর মালিকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। আমি ওকে ঠেকিয়ে রেখেছি, পরে যাব—যাব বলে। আপনি কি চান, আমি ওর সঙ্গে যাই?

রূপম ক্রমশ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এ হেন পরিস্থিতিতে কীভাবে মোকাবিলা করবে এই সংকটের, তা ভেবে দিশেহারা হয়ে গেল। কোনও ক্রমে বলল, দেখছি, কাল কিংবা পরশু—

ফেরার পথে খেয়াল করছিল রূপম, সেণ্টু বারবার তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল আয়না দিয়ে। তার জি. এম. সাহেব কিছু একটা গোলমালের ভেতর জড়িয়ে পড়েছে তা বোধ হয় আঁচ করেছে। রূপম অবশ্য গম্ভীর হয়ে রইল সারাটা পথ।

একটু পরে, ফ্ল্যাটে ঢুকতে না ঢুকতে শুনল অরুণিমার তীক্ষ্ম ঝঙ্কার, আবার টেলিফোন এসেছিল বহরমপুর থেকে। তোমার গুণধর ভাইয়ের।

১০

টিটোই ডেকে দিয়েছিল তার মাকে, মা ফোন এসেছে। অরুণিমা রিসিভার তুলতেই ওদিক থেকে শৌভিকের গলা, বৌদি, মা ভেবেছিল, চিঠি পেয়ে দাদা একবার এখানে আসবে।

তৎক্ষণাৎ অরুণিমার হাতের মুঠি শক্ত হয়ে গেল, তোমার দাদার অফিসে এখন ভীষণ কাজের চাপ। জাপান থেকে পাওয়া পনের লক্ষ টাকার অর্ডার ক্যানসেল হয়ে গেছে। তাই নিয়ে খুব গোলমাল চলছে। তারপর ট্যুরের পর ট্যুর।

ওদিক থেকে শৌভিক বলল, কিন্তু মা খুব ভেঙে পড়েছে। এই বিপদের সময় দাদা এসে পাশে না দাঁড়ালে—

শৌভিকের কথা শেষ হওয়ার আগেই অরুণিমা বলল, তোমার দাদা ওখানে গেলেই কি বাবা ফিরে আসবেন?

শৌভিক কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল, তারপর বলল, ওদিকে বাড়িঅলা খুব ঝামেলা করছে আমাদের সঙ্গে, বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে। মা বলছিল, একবার কলকাতা যাবে আলোচনা করতে।

শুনে অরুণিমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল, তৎক্ষণাৎ বলল, টিটোর তো সামনে পরীক্ষা। ভীষণ পড়ার চাপ ওর।

শৌভিক তবুও ফোন ছাড়েনি, বলল, কতদিন চলবে ওর পরীক্ষা।

—তা মাসখানেক হবে। আসতে হলে তার পরেই না হয়—, বলে অরুণিমা ফোন রেখে দিয়েছে।

রূপম শুনতে শুনতে কিরকম অস্বস্তি বোধ করছিল। ফোনটা সে ধরতে পারলেই ভাল হতো। কিন্তু আজ ফিরতে এত দেরি

হবে বুঝতে পারেনি। সেই কথাই তীব্রভাবে জানান দিল অরুণিমা, তোমার তো অফিস আর শেষ হয় না। রোজ নটা-দশটা বাজছে বাড়ি ফিরতে। তিন-তিনবার অফিসে ফোন করেছি, প্রতিবারই বলেছে, সাহেব তো অনেকক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেছেন। তোমার কি আজকাল রোজ বাইরে বাইরে কাজ ?

—এক এক্সপোর্টারের সঙ্গে মিটিং ছিল। রূপম চট করে যে মিথ্যেটা জিবের ডগায় এল বলে গেল।

—আমার হয়েছে যত জ্বালা। এখন কোথায় যাই, কোথায় গেলে তোমার খোঁজ পাওয়া যাবে কিচ্ছু বুঝতে পারিনে, ওদিকে রোজ-রোজ একবার করে ফোন। ভাবছে, বড় ছেলে ওখানে গেলেই সব সমস্যা মিটে যাবে।

—তার চেয়ে মা আসতে চেয়েছিল, সেটাই বোধহয় ভাল ছিল।

শুনে ছটফট করে উঠল অরুণিমা, সেটাই ভাল ছিল? মা এলে কি একা আসত? শৌভিক সঙ্গে আসত না? তখন দুজনে এলে কি বলাকা একা থাকত ওখানে? এইটুকু ফ্ল্যাটে নিজেরাই ভাল করে নড়াচড়া করতে পারিনে। আরও তিনজন এলে নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা থাকত! টিটোর পড়াশুনো তো মাথায় উঠে যাবে তাহলে।

অরুণিমার প্রবল ঝংকারে রূপম একেবারে নিস্তেজ হয়ে যায়। আস্তে আস্তে ঢুকে গেল ওপাশের ঘরে, বোধহয় জামাকাপড় বদলাতে। অরুণিমা সেদিকে তাকিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগল। তারপর পায়ে ধুপধাপ শব্দ তুলে চা করতে ঢুকল কিচেনে। অন্যদিনের চেয়ে অনেক জোরে শব্দ তুলতে লাগল কেটলি-চামচ-কাপ-প্লেটের। হাত থেকে চামচটা একবার পড়েও গেল মেঝেয়। তার ঝিনঝিন শব্দ রূপমের কানে পৌঁছতেই সে একবার উঁকি দিল রান্নাঘরে, কিছু ভাঙল নাকি?

—ভাঙেনি এখনও, তবে ভাঙবার পথে। বলে চায়ের কাপ প্লেটে বসিয়ে রেখে এল সেণ্টার টেবিলের ওপর।

মাত্র এককাপ চা দেখে রূপম অবাক হল। সে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর তারা দু'জনে রোজ একসঙ্গে বসেই চা খায়।

সকালে একবার বিকেলে একবার। আজ হঠাৎ এক কাপ চা দেখে চোখ তুলল রূপম, তুমি খাবে না ?

—না। অরুণিমার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—কেন, চায়ের ওপর রাগ হল কেন ?

—খেতে ইচ্ছে করছে না।

—ধুর, চা কি একা-একা খাওয়া যায় ? তোমার জন্যে করনি না কি ?

—না।

—বাহ্, আমার ওপর রাগ করে চা বর্জন করলে ? যাও, আর একটা কাপ নিয়ে এসো। আধাআধি করে নিই।

আমি চা খাব না। সোফায় বসে ছিল অরুণিমা, বলতে বলতে উঠে গেল চট করে, ড্রইংরুমের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখতে লাগত মুখ অন্ধকার করে।

রূপম দেখতে পাচ্ছিল, তখনও বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে অরুণিমা, হেসে বলল, অত বিচলিত হয়ে পড়ছ কেন ? ব্যাপারটা নিয়ে কিছু একটা ভাবাও তো দরকার।

—কী ভাববে তুমি ? ওরা তো আসতেই চাইছে। একবার এসে উঠলে আর কি নড়বে মনে করেছ ? আর সবাই মিলে চলে এলে ওদিকে বাড়ির দখল নিয়ে নেবে বাড়িওলা। ফেরার পথটিও বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আমাদের কী হবে!

রূপম হাসতে চেষ্টা করল, সেইজন্যেই তো সেদিন বলেছিলাম, আমিই একবার বহরমপুর যাই। সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখি।

অরুণিমা আর ভাবতে পারছিল না। কী করে এ সমস্যার সমাধান হবে তার মাথায় ঢুকছিলই না। রূপম বরাবরই কোনও ব্যাপারেই সিরিয়াস হয় না। যখন সমস্যা একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে, তখনই নড়েচড়ে বসে। অরুণিমা কতদিন থেকে পই পই করে বলছিল, বাবার মতিগতি ভাল ঠেকছে না। কিন্তু রূপম প্রতিবারই উড়িয়ে দিয়েছে, ধুর, তুমি কী যে বলো! বাবা এই বয়সে কি—

কিন্তু অরুণিমার কথাই শেষ পর্যন্ত খেটে গেল। এ সব ব্যাপার মেয়েরা সবচেয়ে আগে বোঝে। যখনই শুনেছিল তার বাবা কলকাতায় আসছেন, অথচ রূপমের ফ্ল্যাটে না এসে থাকছেন অন্য কোথাও, দেখা না করে চলে যাচ্ছেন, তখনই আঁচ করেছিল, কোথাও একটা গোলমাল ঘটছে।

সেই কথাই বলল অরুণিমা, সমাধান তো আর অমনি-অমনি হবে না। আঙুল বাঁকাতে হবে, তবেই যদি—

রূপম ঠিক বুঝতে পারল না, হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ বৌয়ের দিকে, বলল, কী বললে ?

অরুণিমা তৎক্ষণাৎ চোখ লাল করে ফোঁস করে উঠল, এ সব কথা তো বুঝতে পারবে না। চিরকাল ভালমানুষ রয়ে গেলে। সেইজন্যেই তো আঙুল বাঁকাতে শিখলে না কোনও দিন। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না বুঝলে ? আঙুল বাঁকাতে হয়। বহরমপুর গিয়ে আগে থানায় যাবে। থানায় একটা এফ আই আর করে আসবে।

রূপমের চোখের পাতা পড়ছিল না, সে অবাক হয়ে দেখছিল অরুণিমার তীব্র চাউনি, অস্ফুটকণ্ঠে বলল, এফ আই আর ?

—হ্যাঁ, তোমার পূজ্যপাদ বাবাটির নামে। বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরলে তাইই করা উচিত। তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, এখন ধেই ধেই করে আর একটা ছুঁড়িকে নিয়ে কেটে পড়লাম, আর মজা লুটলাম, সে সব চলবে না। সংসার যখন করেছিলেন, তখন তার দায়িত্ব নিতে হবে। তার পর উনি একটার জায়গায় দশটা বিয়ে করুন, তাতে আপত্তি নেই। থানায় এফ আই আর করলে কোমরে দড়ি দিয়ে যখন ধরে নিয়ে আসবে, তাতে যদি লজ্জা হয়। অবশ্য ওঁর লজ্জা-ঘেন্না কিচ্ছু যে নেই, তা আমার জানা আছে।

বলতে বলতে অরুণিমা হাঁপাচ্ছিল। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। ফুলে উঠছে নাকের পাটা। এই মুহূর্তে শিবপ্রসন্ন রায়কে যদি সে সামনে পেত—

—থানায় ডায়েরি করলেই দেখবে সুড়সুড় করে চলে আসবেন। হিন্দু আইনে দুটো বিয়ে হয় না। সেখানে গিয়ে অল্পবয়সী

ছুঁড়ি নিয়ে যা করার করুন, কিন্তু তোমার মা-ভাই-বোনের দায়িত্ব নিতে হবে। আর কিছু না করুন, কোথায় কী টাকা-পয়সা আছে তা তোমার মায়ের নামে ফিক্সড্ ডিপোজিট করে দিয়ে যান। বুড়ো বয়সে ঘাড়ে রোঁ জন্মালে তো এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

বলতে বলতে হঠাৎ তার নজর পড়ল রূপমের দিকে। রূপম প্রায় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে, মুখ ভয়ে বিবর্ণ। বোধহয় অরুণিমার প্রেসক্রিপসন কার্যকরী হলে কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তাইই উপলব্ধি করে সে দিশেহারা, সন্ত্রস্ত। হয়তো লজ্জিতও হয়ে পড়ছে মনে মনে। পরক্ষণেই তার চোখ গেল রূপমের সামনে রাখা সেণ্টার টেবিলে রাখা চায়ের কাপটির দিকে, এ কি, তুমি চা খাওনি ?

রূপমও সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল, সাড় ফিরতে তাকাল চায়ের দিকে, কাপে হাত দিয়ে বলল, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

অরুণিমা পুণর্বার ক্রুদ্ধচোখে তাকাল রূপমের দিকে, বুঝেছি কেন খেলে না। তোমার বাবাকে কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে আনার কথা বলেছি কিনা, তাই। তবে জেনে রেখো, এইসব লম্পটদের তাইই করা উচিত।

'তারপর দাঁড়াও, চা করে নিয়ে আসি আবার' বলে জুড়োন চায়ের কাপ তুলে নিয়ে ঢুকে গেল কিচেনে।

রূপম এবার সহজ হতে চেষ্টা করল, একটু চেঁচিয়ে বলল, দু-কাপ করে এনো কিন্তু—

মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যে এককাপ নয়, দু-কাপ চা-ই নিয়ে এল অরুণিমা। এতক্ষণে তাকে বোধহয় একটু সুস্থির লাগছে। বোধহয় এতক্ষণ একনাগাড়ে ফায়ারিঙের পর তার ভেতরে জমে ওঠা রাগের উপশম হয়েছে। গরম চায়ে চুমুক দিতে আরও খানিকটা জল হয়ে গেল সে ক্রোধ। আস্তে আস্তে বলল, তাহলে কালই চলে যাও—

—কাল ? রূপম কালই যাবে কি না ভাবতে ভাবতে ছক কাটছিল মনে মনে। কালই যাওয়া সম্ভব কি না, গেলে কী কী সুবিধে, কী অসুবিধে তা ভাবার মধ্যেই হঠাৎ টেলিফোন এল তার। ফোন

তুলতেই ওপারে এম ডি-র গলা, রূপম. কাল একবার নিউআলিপুর যেতে হবে। একটা বাটিক-প্রিন্টের সংস্থা তৈরি হয়েছে ওখানে। কেমন হচ্ছে প্রোডাকশন, দেখে এসে একটা রিপোর্ট দিও তো।

রূপম অবাক হল এমন কী জরুরি ব্যাপার এটা যার জন্য কালই যেতে হবে! একটু ভেবে বলল, ঠিক আছে, কাল অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় নিউআলিপুর ঘুরে আসব।

—বিকেলে নয়, সকালেই অফিস আসার পথে দেখে এসো। বলে এম ডি একটা ঠিকানা বললেন মুখে-মুখে। তারপর ফোন রেখে দিলেন ওদিকে। যেমন রেখে দেন আচমকা।

১১

চেতলা পার্ক পেরিয়ে ডানদিকে বাঁক নেওয়ার আগেই রূপম বলল, একটু নিউআলিপুর ঘুরে যাব, সেন্টু।

ঠিকানা খুঁজে খুঁজে নির্দিষ্ট বাড়িটির সামনে এসে গাড়ি পার্ক করাল সেন্টু। রূপম বাড়ির ভেতর ঢুকতেই বুঝতে পারল, সে যে আজ এখানে আসবে তা যেন জানত এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত মহিলারা। সংস্থার নামটিও অদ্ভুত, নকশী। প্রায় জনা পনের-কুড়ি মহিলা মেঝের উপর ছড়িয়েবিছিয়ে বসে বাটিকের ছাপা কাজে ব্যস্ত। চারপাশে রং, মোমবাতি ইত্যাদি ছড়ানো। নকশীর সেক্রেটারি একজন মাঝবয়সী মহিলা, বেশ গোলগাল চেহারা, নাম রমিতা কর্মকার। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন রূপমকে। তারপর ভিজিটরস খাতাটি সামনে মেলে ধরলেন, স্যার, কিছু লিখে দিন।

খাতাটি খুলেই আশ্চর্য হল রূপম, তেমন ধাক্কাও খেল হঠাৎ। ভিজিটরস বুকে প্রথম যিনি স্বাক্ষর করেছেন তিনি রূপমদের এম ডি হিরণ সান্যাল। সম্ভবত সংস্থাটি উদ্বোধন করতে এসেছিলেন এম ডি, তারপর খাতায় মস্ত প্রশস্তি করে অনেকখানি নোট দিয়েছেন। রূপমও লিখল কিছু। কাল ফোন করার সময় এম ডি কিন্তু ঘুণাক্ষরে বলেননি তাকে যে, তিনিই উদ্বোধন করতে এসেছিলেন নকশী।

আধঘণ্টার মধ্যে কাজ মিটিয়ে বেরোতে যাচ্ছে ঘর থেকে, হঠাৎ কে যেন 'স্যার' বলে ডাকল পিছন থেকে। রূপম অবাক হয়ে পিছু ফিরল, আরও বিস্মিত হল এই দেখে যে, পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কারুবাকী মিত্র।

পরনে সালোয়ার-কামিজ, বেশ জংলা প্রিন্টের, একটু চাপা ধরনেরই যেন, তাতে কারুবাকীর চেহারাটা বেশ উদ্ধত দেখাচ্ছে।

আগের দিন শাড়ি পরেছিল, তখনও বেশ চটকদার মনে হয়েছিল রূপমের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, আপনি এখানে ?

—কেমন দেখলেন স্যার, এদের কাজ ?

—ভালই তো। রূপম তখনও বুঝতে পারছে না, কারুবাকী হঠাৎ এই বাটিক সংস্থায় কেন এসেছে। সে কি জানত, রূপম এখানে আসবে আজ ! তার সঙ্গে অফিসে দেখা করতে পারছে না বলে তার পিছু ধাওয়া করে চলে এসেছে এখানে !

'নকশী'র সেক্রেটারি সেই গাবলুগুবলু চেহারার মহিলা এগিয়ে এলেন, বললেন, কারুবাকীর জন্যই তো আপনাদের কোম্পানি থেকে এত অর্ডার পেয়েছি আমরা। ওর খুব জানাশুনো আছে আপনাদের কোম্পানিতে—

কারুবাকীর হাসি-হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে রূপমের বাকরোধ হয়ে গেল। তাহলে এত সব আয়োজনের পিছনে কারুবাকীর অদৃশ্য উপস্থিতি আছে। সেই কারণেই এম ডি কাল ফোন করে তড়িঘড়ি দেখে আসতে বললেন। তার মানে কারুবাকী এমনভাবে ঝুলে পড়েছে এম ডি-র কাঁধে যে—

সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল রূপমের চোয়ালদুটো। মেয়েটার এলেম আছে। একেবারে খোদ মগডালে বাসা বেঁধে রূপমকেও বাধ্য করেছে তার আজ্ঞাবহ হতে। নিশ্চয়ই এম ডি তাকে আজই একটা রিপোর্ট দিতে বলবেন 'নকশী'র গুণগান বর্ণনা করে। রূপমও যাতে 'নকশী' অর্থাৎ কারুবাকীর বেড়াজালে আবদ্ধ হতে পারে।

অবশ্য এ কথা ঠিক, 'নকশী'র কাজকর্ম বেশ ভালই। বিশেষ করে এমন চমৎকার ডিজাইন করেছে এরা, তা আর পাঁচটা সংস্থার থেকে ঢের আলাদা, অভিনবত্বও আছে তাদের রঙের ব্যবহারে, ফিনিশিঙেও।

রূপম দ্রুত বেরিয়ে আসতে চাইছিল কারুবাকীর সামনে থেকে, কিন্তু গাবলুগুবলু মহিলার কথা তখনও শেষ হয়নি। বলল, এই ডিজাইনগুলো সবই কারুবাকীর। ওর আঁকার হাত এত ভাল—

কারুবাকী আঁকতেও পারে নাকি। তা জানত না রূপম।

বস্তুত 'নকশী'র ডিজাইন দেখে একটু আগেই মনে মনে তারিফ করছিল সে। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হল, ডিজাইনগুলোয় বড্ড বেশি পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের প্রভাব। দেশি ঢং নেইই। অথচ বাটিকে দেশি ডিজাইন বেশি আকর্ষণীয়। বিদেশে সে জন্যই তার চাহিদা।

—তাই নাকি? বলতে বলতে গাড়ির কাছে চলে এল রূপম। গাড়িতে উঠতে যাবে, দেখল কাবুবাকী তার পিছু ছাড়েনি, বলল, 'স্যার, আপনি তো ওদিকে যাচ্ছেন, আমার বাড়ি একবালপুর মোড়ে, একটু যদি নামিয়ে দিয়ে যান। এখন অফিস টাইম, বাসে ওঠা যাবে না।'

রূপম ঝেঁকে উঠে বলতে যাচ্ছিল, না, না, আপনি বাসেই আসুন। কিন্তু বলতে পারল না, হঠাৎ কী মনে হতে গলা নরম করে বলল, 'উঠুন।'

কারুবাকীকে রূপমের সঙ্গে উঠতে দেখে সবচেয়ে যে বিস্মিত হয়েছিল সে সেন্টু। কারুবাকীকে সে ইতিমধ্যেই চিনে গেছে হাড়ে হাড়ে। হঠাৎ রূপমের সঙ্গে মেয়েটিকে দেখে তার মুখটা যে কালো হয়ে গেল তা রূপমের নজর এড়াল না। রূপমেরও বেশ অস্বস্তি হতে লাগল কারুবাকীকে পাশে নিয়ে বসতে। কিন্তু কারুবাকী বেশ স্বচ্ছন্দ, বোঝাই যাচ্ছে এম ডি-র গাড়িতে সে বহু-বার উঠেছে। সেই কারণেই আরও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হল রূপমের। কারুবাকী তখন বলছে, 'স্যার, 'নকশী'টা যদি দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে বেশ কিছু পরিবারের হিল্লে হয়ে যাবে। যারা কাজ করছে ওখানে, তাদের বেশিরভাগই হয় বিধবা, নয়তো স্বামী নেয় না। আমরা এমরকম দুঃস্থ মেয়েদেরই বেছে বেছে নিচ্ছি। এখন আপনার রিপোর্ট যদি ভাল হয়, তাহলে এম ডি বলেছেন, মান্হলি কোটা করে দেবেন 'নকশী'র নামে। আরও নতুন নতুন ডিজাইন করছি, যাতে আমাদের প্রিন্টে প্রতিদিনই বৈচিত্র্য থাকে।'

কারুবাকী একাই বকে যাচ্ছিল, রূপম কখনও 'হ্যাঁ' কখনও 'হুঁ' কখনও 'ঠিক আছে, দেখব' বলে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একবালপুর মোড় আসতে রূপম তাকাল কারুবাকীর দিকে, 'আপনি কোথায় যেন নামবেন বললেন?'

—এই তো স্যার, সামনে, বাঁ-দিকে ঘুরেই।

রূপম কিছু বলার আগেই সেন্টু ঢুকে পড়ল বাঁদিকের গলিতে। সেন্টু ড্রাইভার হিসেবে খুবই সতর্ক। স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে কান রাখে আরোহীদের কথোপকথনের দিকে। কারুবাকীর কথা কানে যেতেই গাড়ি নিয়ে এসেছে গলিতে। কয়েকটা বাড়ি পেরোতেই কারুবাকী 'ব্যাস এখানে, এখানে' বলতেই সে ব্রেক কষল চট করে।

কারুবাকী কিন্তু নামল না, বলল, 'বাড়ির সামনে এসে চলে যাবেন, স্যার? এক মিনিটের জন্য চলুন, কয়েকটা নতুন ডিজাইন করেছি, আপনাকে দেখাই—'

রূপম সজোরে ঘাড় নাড়ল, 'না, না, আমাকে এখন অফিসে যেতে হবে।'

কারুবাকী হাসল, 'স্যার, এতটা দেরি তো হয়েই গেছে, আমাদের সংস্থার কাজ দেখার জন্য, আর সামান্য সময় না হয় দিলেন। এ ডিজাইনগুলো দেখলে আপনার রিপোর্ট নিঃসন্দেহে ভাল হবে। একমিনিট স্যার—'

বলে সে গাড়ি থেকে নামল, তারপর অদ্ভূতভাবে হাসল, 'স্যার আপনি হয়তো ভাবছেন আমার বাড়ি গেলে আপনি অবলিগেশনে পড়ে যাবেন, সে ভয় নেই।'

শেষ কথাটা রূপমকে বাধ্য করল গাড়ি থেকে নামতে। ভাড়া-বাড়িতেই থাকে কারুবাকীরা। ভেতরে পরিসর কম, তবু তার মধ্যেই বেশ সাজিয়ে রেখেছে ঘরগুলো। বাইরের বসার ঘরে হাতে আঁকা কয়েকটা ছবি, ফ্রেমে বাঁধানো। বেশ তারিফ করার মতো ছবিগুলো। রূপম বেশিক্ষণ বসতে চাইছিল না। তার তাড়া-হুড়োর মধ্যে তবুও কারুবাকী নানান ধরনের ডিজাইন একে-একে বার করে দেখাল। ডিজাইনগুলোর রঙের ব্যবহারই চমৎকৃত করছিল তাকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করতেই হল, 'আপনি আর্ট কলেজে পড়েছিলেন নাকি?'

—না স্যার। পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম. এ করার পর চাকরি না পেয়ে শর্টহ্যাণ্ডটাইপিং শিখব বলে কমার্শিয়াল কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। টাইপিং শিখতে শিখতে বিয়ে হয়ে গেল।

রূপম চমকে উঠল, 'আপনি বিবাহিত? কই, বোঝা যায় না তো—'

কারুবাকী হাসল, বিয়ের ছ মাসের মধ্যে সে পাট চুকে গেছে। নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছিলাম। শখ করে যার কাছে ছবি আঁকা শিখতাম, তাকেই। তখন জানতাম না সে এমন সাংঘাতিক। যখন জানলাম, তার অনেক আগে থেকেই এমন অত্যাচার শুরু করেছিল, বাধ্য হয়ে চলে আসতে হল বাবার কাছে।

রূপম বুঝতে পারছিল, অন্য ঘরগুলো থেকে অনেক কৌতূহলী চোখ তাকে অলক্ষ্যে অনুসরণ করছে। খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল রূপমের। কারুবাকীই জানাল, তার বাবা রিটায়ার্ড, পেনসনের সামান্য টাকায় সংসার চলে, মা আছেন, তা ছাড়াও এক ভাই, এক বোন। তারা কেউ কলেজে, কেউ ইস্কুলে, তার ওপর কারুবাকী ঘাড়ে চেপে বসায় সংসারের অবস্থা সঙ্গীন।

রূপম উঠে পড়ল একটু পরেই। সে জানত, একবার সুযোগ পেলেই কারুবাকী বুঝিয়ে দেবে চাকরি পাওয়াটা তার কতখানি দরকার। আরও অসংখ্য চাকুরি প্রার্থীকে তাদের কোম্পানিতে ঘোরা ঘুরি করতে দেখেছে। কেউ ইন্টারভিউ জোগাড় করেছে, কেউ তাতে উত্তীর্ণ হয়েছে, অনুত্তীর্ণের সংখ্যাই বেশি। কেউ বা ইন্টারভিউ পায়নি কখনও। চাকরি সবারই চাই, কিন্তু পাবে একজন কি দুজন। অতএব মুখ শক্ত করে সমস্যার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে হয় চাকুরিদাতাকে। এক্ষেত্রে রূপমও অনুপায়।

ঘরের বাইরে বেরোতে বেরোতে কারুবাকী বলল, 'তবু স্যার, এম ডি সাহেব অনেক অর্ডার পাইয়ে দিয়েছেন নকশীকে। তাতে মাসে দুশো-তিনশো টাকা করে এক একজন পাচ্ছে। অভাবের সংসারে তাইই যথেষ্ট।'

রূপম তাকাল কারুবাকীর দিকে। মনে মনে স্বীকারও করল, মেয়েটি যা হোক করে অর্ডার তো জোগাড় করেছে। তার জন্য কতখানি মূল্য দিতে হয়েছে তা অবশ্য জানে না রূপম।

ঠিক সেই মুহূর্তে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির দিকে যেতে যেতে কারুবাকী বলল, 'স্যার, এম-ডি-র কাছ থেকে এইটুকু পেতে দারুণ সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার।'

রূপম অবাক হয়ে তাকাল, 'কেন?'

—'স্যার', কারুবাকীর চোখে জল এসে গেল হঠাৎ, 'দু'মাস হয়ে গেল আমি প্রেগন্যাণ্ট।'

কারুবাকীর কথাগুলো তীর হয়ে ঢুকে গেল রূপমের বুকে। তার পা দুটো নিথর হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কারুবাকী বলছে কী! অবশ্য গত কয়েকদিনের ঘটনায় এরকম কিছু একটা আঁচ করেছিল সে। হিরণ সান্যালকে সে হাড়ে-হাড়ে চেনে। কারুবাকীকে নিয়ে যখন খেলতে শুরু করেছেন, তখন কিছু একটা ঘটবেই এমন জানত।

এখন জেনে ফেলে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করল না রূপম। কারুবাকীর মুখের দিকে আর তাকাতেই পারল না। গাড়িতে উঠেই সেন্টুকে বলল, অফিস।

সেন্টু নিশ্চয়ই অবাক হয়েছে, হয়তো ভাবছে তার সাহেব এই খতরনাক মেয়েটার পাল্লায় পড়ল কী করে! সেটা রূপমও ভেবে চলেছে। হঠাৎ এভাবে কারুবাকীর বাড়ি চলে আসাটা ঠিক হয়নি। তাকে গাড়িতে নিয়ে অসাটাও। বিশেষ করে কারুবাকী যখন অবৈধ-ভাবে একটা চাকরির সন্ধানে তার কাছে ঘোরাঘুরি করছে।

আর কী আশ্চর্য! অবৈধভাবে চাকরিটা জোগাড় করতে গিয়ে তাকে এক অবৈধ সন্তানের মাতৃত্ব অর্জন করতে হয়েছে।

একবালপুর মোড় থেকে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস পর্যন্ত গোটা রাস্তা তাকে যেন জুরে ঘিরে ধরল। ব্যাপারটা কীভাবে ট্যাকল করবেন হিরণ সান্যাল তা ভেবে পাচ্ছে না। অন্যের অবৈধ সন্তান, তাতেই চোখে সর্ষেফুল দেখছে রূপম। যেহেতু সে কাজ করে এই কোম্পানিতে, হিরণ সান্যাল ঘটনাক্রমে তারই ওপরঅলা, অতএব এই ভয়ংকর অপকর্মটিতে সে নিজেও যেন একজন অংশীদার ভাবতেই সমস্ত শরীর ভীষণভাবে শিরশির করে উঠল। সেন্টু অফিস চত্বরে গাড়ি ঢুকিয়ে দিতেই লাফিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। এমনকি কৌতূহলী সেন্টুর দিকেও চোখ রাখতে পারল না।

অফিসে ঢুকে প্রথম যে কথাটা তার মনে হল, এম ডি-র কাছ থেকে জাপান-কেলেঙ্কারির সেই স্যাম্পল-কার্ডটি আগে দেখা দরকার। স্যাম্পল-কার্ডটি নিয়ে সে কদিন ধরে রীতিমতো দুশ্চিন্তায়, কিছুটা অস্বস্তিতেও আছে। কিন্তু সরাসরি এম ডি-র কাছে চাইল না। আসলে হিরণ সান্যাল নামক মানুষটিকে এখন ভীষণ ঘৃণার চোখে দেখছে সে। লোকটা দুশ্চরিত্র, সমাজে বসবাসেরও অযোগ্য। অথচ হাজার অন্যায় কাজ করেও বেশ ডাঁটিয়ে কাজ করে চলেছে। যে দুষ্কর্মটির কথা শুনে দুর্ভাবনায় জেরবার হচ্ছে রূপম, রাতে ঘুমই আসবে কিনা সন্দেহ, এমনকি অরুণিমার কাছেও কোনওক্রমে প্রকাশ করতে পারবে না এহেন জঘন্য অপরাধটির সংবাদ, সেখানে এম ডি দিব্যি খোসমেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কোনও রকম টেনশন ছাড়াই। অন্তত তাঁকে দেখে রূপম তো কিছুই অনুভব করতে পারছে না।

স্যাম্পেল-কার্ডটি সে চাইল চিফ প্রকিওরমেন্ট ম্যানেজার অরিত্র চট্টরাজের কাছে। অরিত্র চট্টরাজ অবশ্য বললেন, 'দাঁড়ান, এম ডিকে বলি—'

মিনিট কয়েকের মধ্যে অবশ্য অরিত্র চট্টরাজ মারফৎ যে দুঃসংবাদটি রূপমের কাছে এল তা হল, এম ডি নাকি এই মুহূর্তে স্যাম্পেল কার্ডটি খুঁজে পাচ্ছেন না। সেদিন নাকি কার্ডটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছিলেন অনেকক্ষণ. তারপর যত্ন করে রাখতে গিয়ে কোথায় রেখেছেন, টেবিলের ড্রয়ারে, না কি আলমারিতে তা কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। ড্রয়ারে খুঁজেছেন, কিন্তু তার ভেতরে নাকি নেই। কাল আলমারিটা একবার খুঁজে দেখবেন।

খবরটা রূপমের কাছে দারুণ বিস্ময়ের। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট, যার সঙ্গে পনের লক্ষ টাকার ক্ষতি জড়িত, তা এম ডি খুঁজে পাচ্ছেন না এটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা নিয়ে ভাবনা উদয় হতেই পারে। হিরণ স্যানাল যে ধরনের মানুষ, তাতে এই ধরণের ডকুমেন্ট তাঁর কাছে স্বর্ণখনির মতো। কারণ তাতে দুএকজন সাবর্ডিনেট অফিসার তাঁর হাতের মুঠোয় এসে যাবে। অতএব তাদের প্রাণভোমরাটি খুবই সতর্কভাবে তাঁর নিজের হেপাজতে

রেখে দেবেন, যাতে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তা কাজে লাগানো যায়। তাহলে এখন এই যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলছেন তার ভেতর কি অন্য কোনও অর্থ লুকোন আছে! না কি কোনও প্রিয়পাত্র অফিসারকে এই কেলেঙ্কারির দায় থেকে আড়াল করতে চাইছেন! কাকে আড়াল করতে চাইছেন! অরিত্র চট্টরাজ, বিনীথ শাসমল, অথবা বর্ণিল দত্তগুপ্তকে? না কি কদম বসাককেই? গুরুত্বপূর্ণ স্যাম্পেল কার্ডটি না পাওয়া গেলে প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে অপরাধী।

সেদিন সন্ধে পর্যন্ত বেশ চিন্তামগ্ন হয়ে রইল রূপম। আরও বেশ কয়েকটা এক্সপোর্টের কোয়ারি এসেছে বিদেশ থেকে। তার মধ্যে জাপান থেকে দু-তিনটে। সম্ভবত আগে যে অর্ডারটি পেয়েছিল, যার অর্ডার শেষ মুহূর্তে ক্যানসেল করতে হল, তাদেরই কোনও সহযোগী কনসার্ন এই কোয়ারিগুলো পাঠিয়েছে। তারা তো জানে না, কী কেলেঙ্কারির পরিপ্রেক্ষিতে আগের অর্ডারটি বাতিল করতে হয়েছে।

বাড়ি ফেরার পথে সেন্টু বেশ অবাক করল তাকে। একটা ছোট্ট পার্স সে কুড়িয়ে পেয়েছে পেছনের সিটের নীচে। কিছু খুচরো টাকা-পয়সা ছাড়াও দুটো স্লিপ আছে। একটি লণ্ড্রির, অন্যটি ক্যাসমেমো। কাগজগুলো পড়ে বুঝল, পার্সটি কারুবাকীর। সকালে গাড়িতে যখন উঠেছিল, তখনই ফেলে গেছে। পার্সটা পেয়ে বেশ বিব্রতই হল সে। টাকা-পয়সা তেমন বেশি না থাকলেও কারুবাকীর কাছে তা হয় তো অনেক। তা ছাড়া স্লিপদুটো তো নিশ্চয়ই দরকারি। এখন পার্সটা কীভাবে কারুবাকীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়!

বেশ কিছুক্ষণ দোনামোনা করে পার্সটা রেখে দিল তার অ্যাটাচিতে। নিশ্চয়ই দু-একদিনের মধ্যে কারুবাকী তাদের অফিসে আসবে। তার কাছে না হোক, এম, ডি-র কাছে আসবেই। তখন দিয়ে দেওয়া যাবে—

গাড়ি থেকে যখন তার ফ্ল্যাটের সামনে নামল, প্রায় আটটা বাজে ঘড়িতে। একবার হঠাৎ মনে হল সায়ন্তনীর কথা। পায়েল নিশ্চয়

তাকে চাপ দিচ্ছে তাদের রেস্তরাঁয় যাওয়ার জন্য। যে মেয়ে একবার খারাপ পথে পা দিয়েছে, সে চাইবে আরও কেউ কেউ বাধ্য হয়ে সেই পথেই যাক। সায়ন্তনীর কথা ভেবে হঠাৎ ভীষণ কষ্ট হল তার। কীভাবে বেচারিকে বাঁচাবে বুঝতে পারল না। একবার তাকে বাঁচিয়েছে ট্রেনের কামরা থেকে। সে তবু একরকম বাঁচানো। কিন্তু এখন তার সামনে যে ভয়ংকর পরিস্থিতি, তার থেকে বাঁচানো আরও ঢের কঠিন কাজ। এর নাম জীবনযুদ্ধ। ধর্ষণের চেয়েও আরও নিষ্ঠুর এই বেঁচে থাকা।

কালই একবার সে যাবে সায়ন্তনীর কাছে।

১২

—আমাকে একটা চাকরি দেখে দিন না।

সায়ন্তনীর কাছে যখন পেঁছিল রূপম, ঘড়িতে সন্ধে সাড়ে সাতটার মতো। পায়েল ঘরে ছিল না, একাই বসে আছে সায়ন্তনী, বিকেলে গা ধুয়ে, সামান্য ফিটফাট হয়ে। যেন রূপম আসবে সে জানতই। আর সে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এমন কঠিন একটি সমস্যা আছড়ে ফেলল তার ওপর। চকিতে কারুবাকীর কথা মনে পড়ে গেল রূপমের। কারুবাকীও আজ কতদিন ধরে তার পেছনে ধাওয়া করে চলেছে, এম ডি-র পি এ-র চাকরিটি তাকে দিতেই হবে। রূপমও দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে, কিছুতেই নিয়ম ভেঙে, বলা যায়, বেআইনিভাবে তার হাত দিয়ে কারুবাকীর চাকরিটি যাতে না হয় সে কথা ভেবেই। অথচ এখন সায়ন্তনী সেরকমই পৃথিবীর একটি দুরূহতম দায়িত্ব তার কাঁধে চাপাতে চাইছে।

রূপম এড়াতে চাইল প্রসঙ্গটা. এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'তোমার বান্ধবী কোথায় ?'

—পায়েল হোটেলে গেছে। আজ নাকি কী একটা বিশেষ দিন ওদের হোটেলের। জন্মদিন-টন্মদিন হবে। মহাভোজের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রচুর গেস্ট আসবে। আমাকেও নিয়ে যাবে বলে খুব ধরেছিল।

—তা গেলে না কেন ?

—গেলে আপনি বুঝি খুব খুশি হতেন ?

রূপম তাকাল সায়ন্তনীর মুখের দিকে। কয়েকদিন হোস্টেলে কাটিয়ে সে এমনিতেই বিব্রত, বিরক্ত, তার ওপর রূপমের কথায় নিজেকে আর সামলে রাখতে পারেনি। মুখেচোখে ক্ষোভ, ক্রোধ একইসঙ্গে উপছে পড়ছে। সায়ন্তনী যে যায়নি তাতে অবশ্যই খুশি

হয়েছে রূপম। সে বুঝতেই পারছে, আর কিছুদিন পায়েলের কাছে থাকলে সায়ন্তনীকে আর নির্বিঘ্ন রাখা যাবে না। পায়েল নিশ্চয় তার কাছে নানারকম প্রলোভনের পথ দেখাচ্ছে। সায়ন্তনীর কাছে এখনও তা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। হয়নি বলেই সে রূপমের কাছে পরিত্রাণের পথ খুঁজছে।

—আমার কথার কিন্তু উত্তর দেননি আপনি। এক্ষুণি একটা চাকরি জোগাড় করে দিতেই হবে।

সায়ন্তনী এমনই চাপ দিয়ে বলছে কথাটা, এতটাই আকুতি ঝরে পড়ছে তার কণ্ঠস্বরে যে, রূপম বিব্রতবোধ করল। বিচলিতও বোধ করছে ভেতরে ভেতরে। এহেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে সে অন্য প্রসঙ্গে টেনে নিয়ে গেল সায়ন্তনীকে, কিন্তু তার আগে আমার তো জানা দরকার, হঠাৎ কেনই বা আর বাড়ি ফিরতে চাইছ না, যোগাযোগ করতে চাইছ না চেনা-পরিচিতদের সঙ্গে, সেটা নিশ্চয় এবার বলবে।

সায়ন্তনী এতক্ষণ রূপমের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল, হঠাৎই মিইয়ে গেল একেবারে। সে তার জীবনের দুর্বলতম অংশটি সযত্নে গোপন করে চলেছে রূপমের কাছে। পায়েলকেও নিশ্চয় বলে দিয়েছে সে সম্পর্কে যেন কিছু না বলে রূপমকে। কিন্তু রূপমও বুঝতে পারছে না কী এমন ঘটেছিল সায়ন্তনীর জীবনে যা তাকে এতটাই সিঁটিয়ে রেখেছে, যার জন্য সে ভুলে যেতে চাইছে পুরনো জীবন।

কয়েক লহমা স্তব্ধ হয়ে থেকে সায়ন্তনী বলল, 'তা একান্তই জানা দরকার আপনার?'

রূপম তার আগের সিদ্ধান্তে অনড় রইল, কেননা সায়ন্তনীকে নিয়ে এখন সে কী করবে, কোথায় রাখলে তার পরিত্রাণ মিলবে তা ভেবে কুলকিনারা করতে পারছে না। বরং সায়ন্তনীর অতীত জানা গেলে যদি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে—

—জানা দরকার বলেই তো সেই প্রথমদিন থেকেই জিজ্ঞাসা করছি তোমাকে। হঠাৎ একটা মেয়ে কোনও সংসার থেকে তো এমনি-এমনি হাপিস হয়ে যায় না।

সায়ন্তনীর চোখ দুটো যেন ধক ধক করে জ্বলছিল। তার ভেতরে এক প্রবল হতাশা, ব্যর্থতা থম হয়ে রয়েছে কতদিন ধরে, তা উসকে দিতেই যেন সেটা আক্রোশে রূপান্তরিত হয়ে হামলে পড়ল রূপমেরই ওপর, 'কত মেয়েই তো কত কারণে এভাবে ঘর ছেড়ে বেরোয়। খোঁজ নিলে দেখতে পাবেন, এমন কোনও কারণ থাকে তা হয়তো বাইরের মানুষের কাছে নিতান্তই হাস্যকর, কিন্তু যে ভুক্তভোগী, তার কাছে সে মুহূর্তে খুবই প্রয়োজনীয়।'

রূপম একটাও কথা না বলে লক্ষ করছিল সায়ন্তনীর অভিব্যক্তি। যেন ভীষণ একটা ঝড় চলছে তার ভেতরে, যার জন্য নিঃশ্বাসের দ্রুততায় ওঠাপড়া করছে তার বুক। রূপমের দিকে তাকিয়ে আছে খরদৃষ্টিতে, যেন তার এই বিধ্বস্ত জীবনের দায়ভাগ রূপমেরই।

—আমার ছোটবেলায় মা মারা গিয়েছিল। জ্ঞান হয়ে তাঁর ছবিই দেখেছি কেবল, মানুষটাকে নয়। আমাকে মানুষ করার জন্যই দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে হয়েছিল আমার বাবাকে। তা আমাকে মানুষও করে তুললেন সেই দ্বিতীয় মা। সঙ্গে তাঁর নিজেরও দুটো ছেলে মেয়ে হল। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, দ্বিতীয় মায়ের কাছে আর ভালবাসা পাইনি, যদিও বাবার কাছে আমি ছিলাম প্রাণ। বাবা অবশ্য অনেক চেষ্টা করতেন, যাতে, আমি কষ্ট না পাই, কিন্তু আমার কেবলই মনে হতো, আমি না থাকলে আমার বাবা-মা ভাইবোন সবাই-ই যেন আরও একটু সুখে বাস করত। আমার গানের গলাটা ছিল ভাল। আমাকে গান শেখানোর জন্য বাবা ছোটবেলা থেকে মাস্টার রেখেছিলেন। যত বড় হয়ে উঠতে লাগলাম, আমার গানের গলাও খুলতে লাগল। পুরনো মাস্টার বদলে বাবা আরও ভাল মাস্টার রাখতে লাগলেন আমার জন্য। শেষ যে মাস্টারমশাইটিকে আমার জন্য রাখলেন, তাঁকে দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি চমৎকার তাঁর গানের গলা।

সায়ন্তনী থামল এক মুহূর্ত, যেন রূপমকে ভাল করে দেখল একবার। তার দুচোখে তখন সেই আগুনের ধকধকি, যা তাকে অবিরাম পোড়াচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে।

—সেই মাস্টারমশাইকে দেখে হঠাৎ আমার মাথাটা ঘুরে গেল। সপ্তাহে দু'দিন করে এসে থাকতেন রাউরকেল্লায়। হয়তো কলকাতা থেকেই আসতেন। কিন্তু সেকথা কখনও জিজ্ঞাসা করিনি তাঁকে। ও এলাকায় আরও অনেকেই গান শিখত তাঁর কাছে। আমার চেনাজানা কয়েকজন বান্ধবীও। অবাক হয়ে দেখতাম, তারা সবাইই সেই মাস্টারমশাইয়ের জন্য পাগল। মাস্টারমশাই কিন্তু আমাকেই সবচেয়ে পছন্দ করতেন। দুঘণ্টা গান শেখানোর কথা, কোনও কোনও দিন তিন ঘণ্টা সাড়ে তিন ঘণ্টাও সময় দিতেন আমাকে। শুনে আমার বান্ধবীরা হিংসেয় জ্বলেপুড়ে যেত। বলত, কী রে, তুই মাস্টারমশাইকে একেবারে কব্জা করে নিয়েছিস মনে হচ্ছে।

তাতে আমার খুব মজা লাগত। এ একধরনের যুদ্ধজয়ের আনন্দ। মাস্টারমশাইও—

সায়ন্তনী আবারও থামল। থামল নয়, তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল যেন। কী এক স্মৃতিতে সে বিহ্বল হয়ে পড়ছে।

—মাস্টারমশাইও তখন আমাকে নিয়ে পাগল। আমাদের বাড়িতে আমার মা, মানে দ্বিতীয় মা সারাক্ষণ নজর রাখতেন বলে আমরা বাইরে দেখা করতে লাগলাম। কখনও অনেক দূরের কোনও রাস্তায় কিংবা পার্কে, কখনও রেস্তরাঁয় পর্দা-ঘেরা কেবিনে। কিছুদিনের মধ্যেই মাস্টারমশাইয়ের প্রেমে পাগল হয়ে গেলাম আমি। মাস্টারমশাই তখন আমার শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

আমার দ্বিতীয় মা বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলেন, দু-একবার সাবধানও করে দিলেন আমাকে। আমি তাঁর কথা না শোনায় নানারকম অত্যাচারও শুরু করে দিলেন আমার ওপর। বরাবরই আমাকে একটু বিমাতৃসুলভ কটুকথা বলতেন, সুযোগ পেয়ে আরও বেড়ে গেল পীড়ন।

তারপর যা হওয়ার তাই হল। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে একদিন পালিয়ে গেলাম হঠাৎ। কলকাতায় নিয়ে যাবেন বলেছিলেন মাস্টারমশাই। কিন্তু নিয়ে যাননি। ওখানেই একটা গেস্টহাউসে

নিয়ে গিয়ে তুললেন। টানা দিনসাতেক লুকিয়ে রইলাম দু'জনে। ব্যাপারটা নিয়ে কতটা হৈ-চৈ হয়েছিল, তা আমি গেস্টহাউসে থেকে বুঝতে পারিনি, নিশ্চয় বাবা-মাকে অন্য কিছু বলে চাপা দিতে হয়েছিল প্রতিবেশীদের মুখ। হয়তো বলেছিলেন, মেয়ে কলকাতায় বেড়াতে গেছে কোনও আত্মীয় বাড়িতে। কিংবা এরকম কিছু।

শুনতে শুনতে রূপম স্তব্ধ হয়ে গেল। সে এতটা ভাবেনি, বা হয়তো ভেবেওছিল। সায়ন্তনীর তখন ঠোঁটদুটো কাঁপছে। এতক্ষণ যেভাবে প্রকাশ করছিল তার ক্ষোভ, ক্রোধ, এখন তা মিলিয়ে গিয়ে হঠাৎ বুজে আসতে লাগল তার কণ্ঠস্বর। প্রেমের ঘোরের ভেতর যখন মানুষ ডুবে যায়, প্রথমে তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, তারপর যত সময় যায়, তখন সেই ঘোর থেকে বেরুবার জন্য তার ভেতরে তোলপাড় হতে থাকে।

—আমি তখন মাস্টারমশাইকে বলছি, কলকাতায় নিয়ে যাবেন বলেছিলেন, নিয়ে যাবেন না? মাস্টারমশাই রোজই বলতেন, 'হ্যাঁ, কালই যাব।' কিন্তু সেই কাল আর আসছিল না। এদিকে মনে হল, আমাদের জন্য খোঁজাখুঁজি চলছে। মরীয়া হয়ে বললাম, 'এই গেস্টহাউসে আসার জন্যই কি ঘর থেকে বেরিয়েছি?' তখন মাস্টারমশাই বললেন, 'কাল ঠিক যাব, টিকিট পাচ্ছিলাম না, এত-দিনে রিজার্ভেশন কনফার্মড্ হয়েছে। কিন্তু বুঝতেই পারছ, দু'জনে একসঙ্গে স্টেশনে যাওয়া যাবে না। আমার এক বন্ধু কলকাতা থেকে এসেছে। সেও কাল কলকাতা ফিরবে। তুমি তার সঙ্গে গিয়ে ট্রেনে চাপবে।'

বলতে বলতে এবার ফুঁপিয়ে উঠল সায়ন্তনী। বোধহয় যেরকম ঘটেছিল ক'দিন আগে, সেই স্মৃতি তার ভেতর পর পর উপছে পড়তেই তার মনে পড়ে গেল সেদিনকার ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা। কাঁদতে কাঁদতেই সায়ন্তনী ফের বলল, স্টেশনে গিয়ে দেখলাম, একজন নয়, দু'জন বন্ধু। বুঝলাম, মাস্টারমশাই আমার দায়িত্ব এবার বন্ধুদের কাঁধে দিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। সেই দুই বন্ধুই তারপর—, বলতে বলতে আঁচলে মুখ ঢাকল সায়ন্তনী, তাদের

চেহারা দেখেই বুঝেছিলাম, নেকড়ের হাতে আমাকে সমর্পণ করে দিয়ে মাস্টারমশাই—

শুনতে শুনতে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল রূপম। এরকম ঘটনা যে খুব একটা নতুন তা নয়, তবু এহেন বীভৎস পুরনো ঘটনাগুলোই তো সমাজ সংসারে নতুন করে ঘটে। অশ্রুরুদ্ধ, বিষণ্ণ সায়ন্তনীর মুখের দিকে তাকিয়ে রূপম শুধু বলতে পারল, 'তা এতদিনেও তোমার মাস্টারমশাইকে চিনতে পারনি ?'

ঘাড় ঝাঁকাল সায়ন্তনী, 'না, পারিনি। কখনও কখনও মেয়েরা পুরুষের রূপ দেখে এমন মোহে পড়ে যায় যে তখন ভালমন্দ বোঝার সময় থাকে না। সে এক ভীষণ টান যা বলে বোঝানো যাবে না কাউকে।'

রূপম তীক্ষ্ম চোখে তাকাল সায়ন্তনীর দিকে, খুব রূপবান ছিলেন বুঝি তোমার মাস্টারমশাই ?

—ভীষণ ফর্সা, লম্বাচেহারা। শেভ করার পর ফর্সা গালে এমন সবুজ একটা ছাপ ফুটে উঠত যে সেদিকে তাকালেই কেমন শির শির করে উঠত শরীর।

রূপম আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে সায়ন্তনীর চোখের দিকে। মাস্টারমশাইয়ের কথা বলতে বলতে পুনর্বার সেই মোহজাল যেন বিস্তার করছিল তার চোখ দুটিতে। কল্পনা করে সেই চুম্বকের মোহ বোধহয় উপলব্ধি করা যায় না, যা এই মুহূর্তে সায়ন্তনীকে দেখে রূপমের মনে হল। সামান্য হেসে বলল, 'খুবই আশ্চর্য লাগছে এই ভেবে যে, তোমার মাস্টারমশাই তোমার এই অন্ধ প্রেমের মর্যাদা দিলেন না।'

মুখ নিচু করল সায়ন্তনী, 'আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মাস্টার-মশাই বিবাহিত। তাঁর ছেলেমেয়ে আছে।'

রূপম শক খেল, 'তা সত্ত্বেও তুমি তার প্রেমে পড়েছিলে ? না কি জানতে না ? 'জানতাম', সায়ন্তনীর কণ্ঠ বুজে আসতে থাকে, 'এও জানতাম, মাস্টারমশাইয়ের বয়স আমার দ্বিগুণ। আরও জানতাম, আরও অসংখ্য মেয়ে মাস্টারমশাইয়ের প্রেমে পাগল। আরও কতজনকে যে—'

রূপম এতসব অদ্ভুত কাহিনী শুনতে শুনতে ক্রমশ বিস্মিত, হতবাক হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল তাদের কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিরণ সান্যালের সঙ্গে সায়ন্তনীর মাস্টারমশাইয়ের কোনও ফারাক নেই।

যেমন মিলও আছে, পার্থক্যও আছে দুজনের মধ্যে। হিরণ সান্যালকে ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে জোর খাটাতে হয় মেয়েদের ওপর, তার ভেতরে কোনও প্রেম নেই। সায়ন্তনীর মাস্টারমশাইয়ের অস্ত্র তার রূপ, তার শিখায় পুড়ে মরতে ছুটে যায় অল্পবয়সী পতঙ্গরা, হিতাহিত কিছু না বুঝেই।

আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার পর পতঙ্গের তখন সম্বিত ফেরে, এ আমি কী করেছি। সায়ন্তনীও আগুনে ঝলসে যাওয়ার পর এখন থমথমে, বিষণ্ণমুখে তার এই পরিণতির উত্তর খুঁজছে রূপমের কাছে। অনেকক্ষণ পর সেই আগের কথাটাই বলল ফের, 'একটা চাকরি না পেলে আমার আর বেঁচে থাকা হবে না। হয় পায়েলের কথামতো নিজেকে বিসর্জন দিতে হবে তার সেই নরককুন্ডের ভেতর, না হলে আত্মহত্যাই—'

রূপম মৃদু ধমক দিল, 'এত অস্থির হওয়ারই বা কী আছে। বিপদ তো মানুষের জীবনে অনেকভাবেই আসে, তা কখনও চিরস্থায়ী হয় না। বিপদের মুখোমুখি হওয়াই তো জীবন।'

সায়ন্তনী ফুঁসে উঠে বলল, 'নিশ্চিন্তে নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে অমন বড় বড় কথা সবাই বলতে পার। যার নৌকো ঝড়ে ডুবছে মাঝনদীতে, সে তখন মৃত্যুর কথাই ভাবে, জীবনের কথা নয়।

রূপম তা ভাল করেই জানে, জানে বলেই সায়ন্তনীকে এখন ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বলল, 'তবু মানুষ ডুবে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত খড়কুটো খোঁজে। যা কিছু পায় তাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে।'

সায়ন্তনী অদ্ভুতভাবে হাসল, হঠাৎ তীব্রভাবে তাকাল রূপমের চোখের দিকে, হিসহিস করে বলল, 'আপনি আমার সেই খড়কুটো।' বলেই হঠাৎ থেমে গেল একলহমা, তারপর বলে বসল, 'আপনি পারবেন আমাকে বাঁচাতে? বিয়ে করতে?'

'বিয়ে!' রূপম টাল খেয়ে গেল মুহূর্তে, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলল, 'তুমিই বা আমার কতটুকু জান? আমি বিয়ে করার অবস্থায় আছি কি না, করা যায় কি না, সেটাও তো তোমাকে ভাবতে হবে।'

সায়ন্তনী কেমন অপ্রকৃতিস্থের মতো বলে উঠল, 'আমি সেসব কিছুই জানতে চাইনে। যদি আমাকে না-ই রক্ষা করতে পারবেন, তাহলে কী দরকার ছিল সেদিন আমাকে বাঁচানোর?'

রূপম একটু রূঢ় হয়ে উঠল, 'এমন সংকটময় মুহূর্তে তা হওয়াই দরকার। বলল, 'আমি তো সেই মাস্টারমশাই নই যে তোমার অসহায় অবস্থার সুযোগ নেব। আমাকে আরও সময় দাও। আরও কয়েকটা দিন ঠেকিয়ে রাখতে হবে পায়েলকে।'

সায়ন্তনী হাসল, কেমন পাগলের মতোই, বলল. 'পায়েল বলেছে, সামনের রবিবার ওর অফ-ডে। সেদিন আমাকে নিয়ে যাবে ওর মালিকের বাড়ি। সে নাকি মস্ত বড়লোক। চার-পাঁচটা গাড়ি। তিন-চারটে হোটেল চালায়। তার বিশাল শরীর। রোজ একটা করে মুরগি তার জন্যে বরাদ্দ, আর—'

—আর?

—আর রোজ একটা করে মেয়ে। বলে প্রায় হিস্টিরিয়া রোগীর মতো হি হি করে হেসে উঠল সায়ন্তনী।

রূপম কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

রবিবার, অর্থাৎ মাঝে তিনটি দিন। সায়ন্তনীর মাথায় হাত রাখল রূপম, ঠিক আছে. শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আমি সেদিন বিকেলে আসব। একবার বাঁচিয়েছি যখন আরও একবার বাঁচাতেই হবে।

সায়ন্তনী কী বুঝল কে জানে। রূপম যতক্ষণ থাকল সে তার বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে রূপমের ভেতর কী যেন খুঁজতে লাগল আকুল হয়ে।

বাড়ি ফিরতে বেশ দেরিই হয়ে গেল সেদিন। খুবই ভাবনায় ছিল অরুণিমা। দু'বার রাস্তায় নেমে গিয়ে দেখে এসেছে. তার গাড়ি দেখা যাচ্ছে কি না। রূপম ফিরতেই বলল. 'তোমার

এক্সপোর্টারদের সঙ্গে মিটিংগুলো আজকাল সন্ধের পরই হচ্ছে নাকি ?'।

জামার বোতাম খুলতে খুলতে রূপম দায়সারা গোছের একটা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করল। তার আগেই অরুণিমা প্রায় বোম ফাটানোর মতো বলল, 'কারুবাকী মিত্র কে ?'

রূপম আশ্চর্য হয়ে তাকাল অরুণিমার দিকে। হঠাৎ মনে হল, কারুবাকী কি চাকরির সন্ধানে তার ফ্ল্যাটেও এসে হানা দিয়েছে ! না কি টেলিফোন করেছিল তাকে, আর সে টেলিফোন ধরেছে অরুণিমাই !

অরুণিমার দু-চোখ তখন গনগনে ফার্নেস। রূপমের দিকে তাকিয়ে আছে প্রবল ক্রোধ মেলে, পরক্ষণেই যে বস্তুটি সে ছুঁড়ে দিল রূপমের দিকে সেটি সেদিন তার গাড়ির ভেতর পড়ে থাকা পার্সটি। অ্যাটাচিতে রেখেছিল তখন, ভাবেওনি সেটি অরুণিমার গোয়েন্দা চোখে আবিষ্কৃত হয়ে যাবে।

পার্সটি লুফে নিয়ে রূপম বিব্রত, সঙ্কুচিত। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। পরক্ষণেই অরুণিমা যা বলল তাতে শরীরে একটা গরম হলকা বয়ে গেল মুহূর্তে।

'এরকম আর কতজন সঙ্গিনী জুটিয়েছ বলো তো ? ওদিকে এক সায়ন্তনীর জন্য ঝাড়গ্রাম ছুটতে হচ্ছে, এদিকে আর এক কারুবাকীর পার্স অ্যাটাচিতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। সেইজন্যেই রোজ ফিরতে এত রাত হচ্ছে—'

রূপম কিছু বলতে গিয়েও বুঝল বলে লাভ নেই তেমন। একটা মিথ্যে বলতে গিয়ে আরও হাজারো মিথ্যে বলতে হবে। আর সে সবই ধরে ফেলবে অরুণিমা।

অরুণিমার বক্তব্য তখনও শেষ হয়নি। বলল, 'বাবার চরিত্র যখন এরকম, তখন ছেলের চরিত্র অন্যরকম হবেই বা কী করে ছি, ভাবতেই ঘেন্না করছে আমার।'

১৩

কানাডার এক বাঙালি-অ্যাসোসিয়েশন থেকে দু হাজার বাটিক প্রিন্টের শাড়ির অর্ডার আসবে খুব শিগগির, এমন একটি আশা-ব্যঞ্জক খবর ফনোকম্ মারফত রূপমকে জানালেন এম ডি। খবরটি শুনিয়েই তৎক্ষণাৎ রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন ওদিকে। খুব একটা বেশি টাকার অর্ডার নয়, তবু এই ফার্স্ট আওয়ারেই ঘটা করে এম ডি কেন তাকে খবরটা জানাতে গেলেন তা ঘুরপাক খেতে লাগল রূপমের ভেতর।

সম্ভবত কারুবাকীদের সংস্থা 'নকশী'ই পুরো অর্ডারটা পাবে বলেই তাঁর এই উল্লাস।

চট করে ফনোকমের লাইনটা কেটে দিতে রূপম খুবই বিরক্ত হল এম ডি-র ওপর। কিন্তু বিরক্ত হয়ে তো কোনও ফায়দা নেই। তাঁর ইচ্ছে অনিচ্ছেই শেষ কথা। অথচ রূপম ভেবেছিল সে এম ডি-কে জিজ্ঞাসা করবে, জাপান-কেলেংকারির রিপোর্টটা কি ধামা-চাপা দিয়ে রেখে দেবে এখন! রাখতেই হবে, কারণ স্যাম্পেল কার্ডটি এই তদন্তের কাজে খুবই ভাইটাল, সেটি যদি এম ডি-র ড্রয়ার থেকে হারিয়ে যায় বা অফিসের ভাষায় 'মিসপ্লেস্‌ড' হয় তাহলে তদন্তের রিপোর্ট তো গুরুত্বহীন।

ইতিমধ্যে অফিসের অনেকেই তার চেম্বারে ঘোরাঘুরি করে, উঁকিঝুঁকি দিয়ে জানার চেষ্টা করছে, জি এম তাঁর রিপোর্টে কাকে ফাঁসাচ্ছেন। সেদিন বিনীথ শাসমল হঠাৎ সামান্য একটা কাজের ছুতোয় তার চেম্বারে এসে বসল কিছুক্ষণ, কথা শেষ হতে বলল, স্যার, জাপানের কেসটা কী ফাইনালাইজড হয়ে গেছে?

রূপম হাসল, কেন বলতো?

—স্যার, আমি কিন্তু ইচ্ছে করেই সিল্কথানের কোয়ালিটি নিয়ে তখন প্রশ্ন তুলিনি। জানতাম, খারাপ কোয়ালিটির মাল রিসিভ

করছে কদম বসাক, কিন্তু তাকে যখন সিল্ক-এক্সপার্ট হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে কোম্পানি, তখন আমাদের মতামতের আর গুরুত্ব কী ?

—কী আশ্চর্য, তুমি জেনেশুনেও কোম্পানির এত বড় একটা ক্ষতি করলে ? রূপম স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—স্যার, আমরা লেখাপড়া শিখে ডিগ্রি নিয়ে চাকরি করতে এসেছি। আর কদম বসাক গ্রামের কোয়াক ডাক্তারের মতো, ডিগ্রিবিহীন হেতুড়ে। আমি আমার কলিগদের সঙ্গেও ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছি। সবাই মিলে ঠিক করেছি, কদম বসাককে এবার ফাঁসাতে হবে, নইলে কোম্পানির বড়কর্তাদের টনক নড়বে না। তাতে হয়তো আমাকে স্কেপগোট হতে হবে। তাতেও পিছপা হইনি আমি, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের ডিগ্রির গুরুত্ব দিয়ে যাব।

রূপমের মুখে কোনও কথাই জোগাল না। এই সব টেকনিক্যাল ডিগ্রি- হোল্ডাররা ভেতরে ভেতরে খুবই যে ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত ছিল তা ভাবতেই পারেনি কখনও। আর সেই ষড়যন্ত্রের কথা দিব্যি এসে স্বীকারোক্তির মতো বলে যাচ্ছে কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের কাছে। বাহ্, এই না হলে ইয়াং জেনারেশনে !

শাসমল চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ থম হয়ে রইল রূপম। কদম বসাকই পুরো ঘটনার জন্য দায়ী এমন মনে হচ্ছে এখন। না কি স্যাম্পল কার্ডটিই বদলানো হয়েছে কোনও পর্যায়ে! তাই এম ডি তাঁর ড্রয়ার থেকে সরিয়ে ফেলেছেন ওটি !

যা-ই ঘটে থাকুক, আপাতত জাপান-কেলেঙ্কারির তদন্তের এখানেই সলিল সমাধি মনে হচ্ছে। তবু একটা কিন্তু রয়েই যাচ্ছে। কদম বসাককে সাসপেন্ড করা হয়েছে, রূপম ভাল-মন্দ কোনও একটা রিপোর্ট না দিলে তাকে এভাবে অনন্তকাল ধরে সাসপেন্ড হয়ে থাকতে হবে। সেও তো বেশি দিন চলতে পারে না।

জাপানের ভাবনাটা অতঃপর শিকেয় তুলে রূপম ভাবতে বসল সুইজারল্যান্ডের কথা। পাঁচ হাজার ডলারের একটা অর্ডার এসেছে

ক'দিন আগে। এক্সপোর্ট ম্যানেজার বর্নিল দত্তগুপ্তকে বলেছিল এয়ারে ডেসপ্যাচ করতে। দত্তগুপ্ত জানিয়েছিল, ফাইল চেয়ারম্যানের কাছে পাঠিয়েছে, চেয়ারম্যান বলেছেন ডেসপ্যাচের আগে থানগুলোর কোয়ালিটি তিনি নিজের চোখে একবার দেখতে চান। রূপম খুশিই হয়েছিল শুনে, কারণ আর একটা জাপান-কেলেঙ্কারি হোক সেও চায় না।

আমেরিকার দুই সাহেব যে পাঁচশ হাজার সিল্কস্কার্ফের অর্ডার দিয়ে গেছেন, প্রোডাকশন ম্যানেজার এখনও রেডি করে উঠতে পারেননি, তা কাল জেনে নিয়েছিল রূপম। আজ আর একবার তাগাদা দিল ফনোকম তুলে, 'কি পি এম সাহেব, যাদের আপনি অর্ডারটা দিয়েছেন, তাদের ফ্যাক্টরিতে আমাতে-আপনাতে মিলে একবার গেলে হতো। কবে যাবেন, আজই, না কাল? কাল? ও কে।'

আমেরিকার দুই সাহেবের মুখদুটো মগজে ভেসে উঠতেই রূপমের মনে পড়ল এম ডি বলেছিলেন সিল্ক স্কার্ফের ডিলটা ক্লিক করলেই আমাতে-তোমাতে একবার স্টেটসে ঘুরে আসব। হঠাৎ আবেগের বশেই বলেছিলেন মনে হয়। কিন্তু কাল একবার অরুণিমাকে বলে ছিল ঘটনাটা। তখন অবশ্য অরুণিমার হাতে কারুবাকী মিত্রের পার্সটা পড়েনি। অরুণিমা মুখ বাঁকিয়েছিল, 'হুঁ তোমাকে আবার স্টেটসে নিয়ে যাবে।' পরক্ষণেই রূপম বলে ফেলেছিল, 'স্টেটসে না যাই, অন্তত গোয়া যাওয়া হচ্ছে এবার।' বলে ব্যাগ থেকে গোয়ার ইনভিটেসন-কার্ডটি দেখিয়েছিল। সঙ্গে এয়ারের টিকিট। অরুণিমা অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়েছিল নকশা-আঁকা রঙিন কার্ডটার দিকে, আমরাও যাব নাকি!

'ইচ্ছে করলেই যেতে পার।' রূপম একটু অহঙ্কারের সঙ্গেই বলেছিল। শুনে টিটোর কাল কী নাচানাচি, 'সত্যি যাব বাবা?'

গোয়ার সী-বিচের ভাবনাটা আজও যখন তাকে বেশ পেয়ে বসেছে, সে সময় তার চেম্বারের দরজা ঠেলে মুখ বাড়াল কারুবাকী মিত্র, স্যার, একটু আসব?

রূপমের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল, কিন্তু না করতে পারল না। আবার কি চাকরির তদ্বির করতেই এসেছে কারুবাকী!

রূপমের আশঙ্কাই সত্যি হল। কারুবাকী আজ আরও সেজে গুজে, হয়তো রূপমকে ধাঁধিয়ে দিতেই এমন গোলাপিবর্ণা হয়ে এসেছে। সামনে চেয়ারে বসেই বলল, 'স্যার আমার ব্যাপারটা কিছু ভাবলেন ?'

রূপম সহজভাবে বলল, 'না তো।'

—স্যার আমি ভীষণ সমস্যার মধ্যে আছি। আপনি তো নিজের চোখেই সব দেখে এসেছেন। এবারও যদি আপনি আমার কেসটা কনসিডার না করেন, তা হলে—

রূপম আরও সহজভাবে বলল, দেখুন মিসেস মিত্র, আমি একটা প্রিন্সিপ্‌ল্‌ নিয়ে কাজ করি। যেটা আমি কোনও ক্রমেই পারব না, পারা সম্ভবও নয়, সেটা নিয়ে বারবার আমাকে রিকোয়েস্ট করা আমার মোটেই পছন্দ নয়। আপনি এখন যেতে পারেন।

কারুবাকী ওঠার লক্ষণ দেখাল না। আজও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, তারপর বলল, চাকরিটা আমার ভীষণ দরকার। তার জন্যে যদি সারাদিন বসে থাকতে হয় আপনার সামনে, তাও বসে থাকব আজ।

—তাতেও হবে না, মিসেস মিত্র।

কারুবাকী হঠাৎ যেন ফুঁসে উঠল, কেন হবে না, স্যার ? এই চাকরির জন্যে আমি আপনার এম ডি-কে আমার সর্বস্ব দিয়েছি। তিনি প্রথম থেকেই আমাকে বলে এসেছেন, চাকরি আমার হবেই। আর এখন আপনি বলছেন—

—সেটা এম ডি-র কাছেই বলুন। যার কাছে আপনার সর্বস্ব দিয়েছেন, চাকরি তিনিই দেবেন।

কথাগুলো আরও একটু রূঢ়ভাবেই বলল রূপম। তাতে কারুবাকী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল রূপমের দিকে। হঠাৎ তার ঠোঁটদুটো কাঁপতে শুরু করল, পরক্ষণেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, স্যার, আপনি যদি চান তাহলে আপনাকেও—

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল কারুবাকী। দু'হাতে মুখ-

খানা ঢেকে টেবিলের ওপর মাথা নামিয়ে কাঁদতে লাগল হু হু করে। কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর।

আর সেদিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল রূপম। 'আপনি যদি চান তাহলে আপনাকেও—' কি কোনও মেয়ে সুস্থ, স্বাভাবিক অবস্থায় বলতে পারে! কারুবাকী কি ভেবেছে, রূপমদের এম ডি লম্পট, চরিত্রহীন বলে তাঁর অফিসের জেনারেল ম্যানেজারও তাই! কারুবাকী লোভ দেখিয়ে রূপমকে প্ররোচিত করছে তাকে চাকরিটা দেওয়ার জন্যই!

রূপম ভেবেছিল বেশ কড়া কথা বলে কারুবাকীকে একটা ধমক দেবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাদের কোম্পানির ইউনিয়নের লিডার বচন তরফদার হঠাৎ ঢুকে কী যেন বলবে বলে এসেছিল, কিন্তু টেবিলে মুখ ঢেকে এক অচেনা তরুণী হাউহাউ করে কাঁদছে দেখে হতভম্ব হয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। রূপম তাতে আরও বিপর্যস্ত হয়ে গেল। বচন তরফদার ভীষণ ঘোড়েল লোক, অফিসারদের দোষত্রুটি খুঁজতে সারাক্ষণ তার এক্স-রে আই নিয়ে ঘুরে বেড়ায় অফিসময়। হঠাৎ কেন একটি তরুণী তার ঘরে বসে কাঁদছে তার সম্ভাব্য কারণ আবিষ্কার করে হয় তো বলে বেড়াবে সবার কাছে। হয়তো এম ডি কিংবা চেয়ারম্যানের কানে পর্যন্ত হাসতে হাসতে পৌঁছে দেবে কথাটা।

ব্যাপারটা কোন পরিণতিতে গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে ঘেমে উঠল রূপম। কিন্তু পরমুহূর্তে কারুবাকী যা করল তাতে ভীষণ চমকে উঠল সে, থর থর করে কেঁপে উঠল তার শরীর।

কারুবাকী হঠাৎ টেবিল থেকে মাথা তুলল। তার চোখের জল মুছে ফেলে কেমন বিকৃত করে ফেলল মুখের অভিব্যক্তি, চোখ দুটোয় রাগ ফুঁসে উঠল মুহূর্তে, তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলে উঠল, তাহলে শুনুন স্যার, আপনারা অফিসাররা সব ব্রুট, ধান্দাবাজ। যখন মধু খাওয়ার দরকার হয়, তখন হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে লুটেপুটে খান। আবার দরকার মিটে গেলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হাত কাঁপে না একটুও। বিবেকের দংশনও হয় না কোনও দিন।

তাহলে অফিসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবাইকে জানিয়ে দেব, আপনিই আমার এই সর্বনাশের জন্য দায়ী।

রূপম চমকে উঠল কারুবাকীর এহেন শাসানিতে। আর কোন দিশে না পেয়ে কারুবাকী এখন রূপমকেই বেছে নিয়েছে তার সমস্ত প্রতিহিংসার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে। যে দায় রূপমের নয়, এখন তা-ই চাপাতে চাইছে রূপমের কাঁধে, যাতে সে ভয় পেতে কারুবাকীকে চাকরিটা দিয়ে দেয়। কিন্তু তা রূপমের পক্ষে কী করে সম্ভব! অথচ কারুবাকী যা বলছে তা যদি সত্যিই সে করে, তাহলে রূপমের সমূহ বিপদ। বচন তরফদার এইমাত্র যে দৃশ্য দেখে গেল, তারপর কারুবাকীর কথা অবিশ্বাস করার কারণ থাকবে না কারও।

আর কিছু ভাবতে পারল না রূপম। এক গভীর আচ্ছন্নতার মধ্য থেকে যখন সম্বিত ফিরে পেল, কারুবাকীকে আর দেখতে পেল না সামনে। একটা তীব্র হুমকীর-মুখে এই কোম্পানির জি এমকে বসিয়ে রেখে সে এতক্ষণে কোথায় গেল, কার কাছে গিয়ে কী বলল কে জানে। সমস্ত ব্যাপারটা রূপমের ভেতর পাক খেতে লাগল একই সঙ্গে আশংকা, ভয়, লোকলজ্জা, ক্রোধ মিলমিশ হয়ে। আর কারুবাকীও আশ্চর্য মেয়ে। হয়তো তাদের এম ডি হিরণ সান্যালই কারুবাকীর মাথায় এই বুদ্ধিটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

কী করবে ভেবে না পেয়ে রূপম বেল বাজিয়ে তার বেয়ারা ছবিলালকে ডাকল, দ্যাখো তো. মেয়েটা আমার চেম্বার থেকে বেরিয়ে কোনদিকে গেল?

হন্তদন্ত হয়ে গেল ছবিলাল। আচ্ছা, ছবিলাল কি কারুবাকীর কান্নার শব্দ তার হুমকি সব শুনেছে বাইরে বসে। না হলে সেও অমন সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছিল কেন রূপমের দিকে?

মিনিট পাঁচ-সাত পরে ছবিলাল ফিরে এসে জানাল, স্যার, মেমসাব নেই। বাহার চলা গিয়া—

আপাতত নিশ্চিন্ত হলেও রূপম ভাবতে বসল তার এখন করণীয় কী। এম ডি-কে তো বলতেই পারবে না ঘটনাটা। এম ডি নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করে পুরো ব্যাপারটা চাপিয়ে দেবেন রূপমের ঘাড়েই।

চেয়ারে বহুক্ষণ গা এলিয়ে বসে থেকেও পরিত্রাণ খুঁজে বার করতে পারল না। একটা ধূসর, মন খারাপ করার অনুভূতি খুব দ্রুত ভয়ংকরভাবে গ্রাস করছিল তাকে। পাঁচটা নাগাদ ফাইলপত্র গুটিয়ে যখন চেয়ার ছেড়ে উঠবে উঠবে ভাবছে, হঠাৎই ফনোকম বেজে উঠল তার টেবিলে, ওদিকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের গলা, একবার আমার চেম্বারে এসো তো, রূপম।

এম ডি-র কণ্ঠস্বর কানে যাওয়ামাত্র পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল রূপমের। হয়তো কারুবাকীর কারণেই ডাকছেন! যদি কারুবাকীর কথাই আলোচনা করতে চান, তাহলে আজ একটা এসপার-ওসপার করে ফেলবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকতেই তাঁর নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শুনল রূপম, বোসো—

রূপমের ভেতর তাপ বাড়ছিল। তাকে বসতে হল, কয়েকটা হাতের কাজ সেরে নিচ্ছিলেন হিরণ সান্যাল। পি এ-কে ডেকে কয়েকটা নির্দেশও দিলেন মিনিট পাঁচেক ধরে। তারপর ঘর ফাঁকা হতেই তাকালেন রূপমের দিকে, জাপানের রিপোর্টটা তৈরি হয়ে গেছে তোমার ?

রূপম বুঝে উঠতে পারছিল না, কোন অ্যাঙ্গেল থেকে কথা শুরু করতে চান এম ডি। জাপানের কথা বলাই তাঁর উদ্দেশ্য. না কি কারুবাকীর কথা ?

রূপম ঘাড় নাড়ল, এখনও হয়নি। সবাইকে ইণ্টারোগেট করেছি। কিন্তু স্যাম্পল-কার্ডটা না পেলে রিপোর্ট লিখতে পারছি না। ওটা বোধহয় আপনার ড্রয়ারেই ছিল। শুনলাম মিসপ্লেস্‌ড হয়েছে কোথাও—

ম্যানেজিং ডিরেক্টর অদ্ভুতভাবে হেসে ঘাড় নাড়লেন, কোথাও মিসপ্লেস্‌ড হয়নি। তোমাকে সেভ করতে ড্রয়ার থেকে বার করিনি এ ক'দিন।

—আমাকে সেভ করতে ? রূপম প্রবলভাবে বিস্মিত হল।

—হ্যাঁ, বলতে বলতে ড্রয়ারটা খুলে ফেললেন এম ডি। অনায়াস-ভঙ্গিতে স্যাম্পল-কার্ডটা তুলে আনলেন ড্রয়ারের এক দুরূহ কোণ

থেকে, তারপর রূপমের সামনে রেখে বললেন, চিফ প্রকিওরমেণ্ট ম্যানেজারের কাছ থেকে স্যাম্পল-কার্ডটা আমি নিয়ে নিলাম। নইলে অন্যদের চোখে পড়লে তোমার নামে সাংঘাতিক একটা স্ক্যাণ্ডাল শুরু হয়ে যেত এতদিনে।

রূপম এতক্ষণ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথাবার্তা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। এখন স্যাম্পল-কার্ডটার দিকে তাকাতেই প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। দেখল, স্যাম্পল-কার্ড থেকে সিল্কের টুকরোগুলো বদলে সবচেয়ে নিম্নমানের সিল্ক সেঁটে দেওয়া হয়েছে সেখানে। কার্ডের নিচে জি এম হিসেবে তার সই।

কমপ্লেন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাইমা ফেসি মনে হয়েছিল, কদম ইজ রেসপনসিবল ফর দি এনটায়ার মিসচিফ। সেই মতো সাসপেণ্ড করা হয়েছিল তাকে। কিন্তু চিফ প্রকিওরমেণ্ট ম্যানেজার সেদিন নিজেই আমার হাতে স্যাম্পল-কার্ডটা দিয়ে বললেন, 'স্যার, কদম বসাকের আর দোষ কী। স্বয়ং জি এম সাহেবই তো খুব ঠাণ্ডা মাথায় কাজটা করেছেন।'

রূপমের শরীর তখন থর থর করে কাঁপছে। এম ডি-র মুচকি হাসি মেশানো মুখের সামনে বসে সে টের পাচ্ছিল গভীর একটা ষড়যন্ত্র তার চারপাশে ঘনিয়ে এসেছে। তার সই করা স্যাম্পল-কার্ড থেকে সুচতুরভাবে স্যাম্পল বদলে তাকে এখন কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ব্যবস্থাপনা প্রস্তুত। সে পাথরের মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল, খারাপ কোয়ালিটির স্যাম্পল দিয়ে আমার লাভ?

—চট্টরাজ আমাকে বলল, তাঁতিদের সঙ্গে জি এম সাহেবের যোগাযোগ আছে। তারা মাল দেবে খারাপ কোয়ালিটির, কিন্তু দাম পাবে বেশি। যে দামটা বেশি পাচ্ছে তাঁতিরা, তার ফিফটি পার্সেণ্ট তোমার, ফিফটি পার্সেণ্ট তাঁতিদের। এরকমই নাকি চুক্তি হয়েছিল তোমার সঙ্গে।

রূপম তখন জামার ভেতরে গল গল করে ঘামছে। কোনও ক্রমে বলতে পারল, আপনি সেই কথা বিশ্বাস করলেন?

এম ডি ফিচফিচ করে কিরকম অদ্ভুত হাসলেন হঠাৎ, চট্টরাজ আমাকে হিসেব করে দেখাল, একবার এয়ারে ডেস্‌প্যাচ করতে

পারলেই কম সে কম একলক্ষ টাকা মার্জিন থাকবে ডিলটায়। আমি সব দেখেশুনে তাজ্জব। তোমার শ্রুডনেস দেখেও আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। যে সময় মাল রিসিভ করে এয়ারে ডেসপ্যাচ হবে, সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তুমি ট্যুর নিয়ে বাইরে চলে গেলে।

এম ডি-র প্রতিটি শব্দই তখন গরম সিসের মতো গলতে গলতে ঢুকছে রূপমের কানে। সমস্ত ষড়যন্ত্রটা এমনই ন্যাক্কারজনক, এতই বীভৎস বলে মনে হচ্ছে যে, প্রতিবাদ করতেও যেন ঘেন্না হচ্ছে তার।

রূপম ভেতরে ভেতরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। তাকে বাগে পেয়ে খুবই আজেবাজে কথা শুনিয়ে যাচ্ছেন এম ডি। কারুবাকীকে দিয়ে ব্ল্যাকমেল করিয়েও সন্তুষ্ট হননি। এখন নিজেও রূপমকে আসামী সাজিয়ে একটা তীব্র চাপ সৃষ্টি করছেন তার ওপর!

কিন্তু এই মুহূর্তে প্রতিবাদ করেও কোনও লাভ হবে না। অনেকদিন ধরে তাকে জব্দ করার জন্য ফিকির খুঁজছিলেন হিরণ সান্যাল। এখন এমনভাবে সাজিয়েছেন সমস্ত কেসটা—

—ঠিক আছে, এখন যেতে পার। স্যাম্পল-কার্ডটা আপাতত কোল্ড-স্টোরেজে পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার মুখ চেয়েই। আমি চাই না তুমি অফিসের সবার সামনে তোমার ক্রেডিবিলিটি হারাও। আর হ্যাঁ, কারুবাকীর অ্যাপয়েন্টমেন্টের ফাইলটা আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

মাথার ভেতরটা হঠাৎ ঝিম ঝিম করে উঠল রূপমের। সমস্ত জীবন তার লড়াই এই ক্রেডিবিলিটি অর্জন করার জন্যই। সৎ হয়ে ওঠাই তার আদর্শ ছিল বরাবর। তারই জন্যে গুচ্ছের অসৎ মানুষের বিরুদ্ধে সে একা সামিল হয়েছিল যুদ্ধে। সেই অসৎ মানুষেরা এখন ঘিরে ধরে তাকেই অসৎ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে।

সমস্ত অপমান নিঃশব্দে হজম করে এম ডি-র চেম্বার থেকে উঠে এল সে। এই চরম হেনস্থার জবাব দেওয়ার প্ল্যাটফর্ম এটি নয়। ব্যাপারটা নিয়ে আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে। স্যাম্পল যে বদলানো হয়েছে স্যাম্পল-কার্ড থেকে, এটি তো প্রমাণ করা দুঃসাধ্য

হলেও লড়াই করা যাবে অন্তত। কিন্তু কারুবাকী যে ঝামেলা পাকিয়েছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অনেক শক্ত কাজ।

এক দুরন্ত, ভয়ঙ্কর অস্থিরতার ভেতর লাট খেতে খেতে রূপম অফিস থেকে নেমে এল নিচে। ততক্ষণে সন্ধে অনেকখানি গাঢ় হয়ে এসেছে। সেন্টু গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল তার সাহেবের জন্য। সে ধীর পায়ে গাড়ির ভেতর নিজেকে ন্যস্ত করতে করতে অস্ফুটকন্ঠে বলল, চলো, সেন্টু—

১৪

সেন্টুও ক'দিন ধরে বুঝে উঠতে পারছে না, ঠিক কী হয়েছে তাদের জি এম সাহেবের। বরাবরই তো শান্তশিষ্ট, সাতে-পাঁচে থাকেন না, এমন মানুষ। অফিসে তাঁকে নিয়ে আলোচনাও হতো এমন সৎ অফিসার কোম্পানিতে কখনও আসেননি বলে। তাঁর হঠাৎ এত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, বেশ দ্রুতই, এত দ্রুত যে সেন্টুও অবাক হচ্ছে আজকাল, বুঝতেই পারছে কী একটা ঝঞ্চাটে পড়েছেন, সেটা কতটা নিজের ইচ্ছেয় তা অবশ্য সেন্টুর বোধগম্য নয়।

আজ অফিস থেকে বেরুতে একটু দেরিই হয়ে গেল জি এম সাহেবের। বেশ গম্ভীর, চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছে। অন্যদিনকার চেয়ে ঢের বেশি। বাড়ি ফেরার গোটা পথে একটাও কথা বললেন না। শুধু নামার আগে বললেন, তুমি তো গাড়ি গ্যারেজ করতে পার্ক সার্কাস যাবে, আমাদের একটু নামিয়ে দিয়ে যাও ভবানীপুর। এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে। মিনিট দশেকের মধ্যেই নেমে আসছি।

দশ নয়, মিনিট পনের পর নেমে এলেন, জি এম সাহেবের সঙ্গে মেমসাহেব।

অন্যদিন সেন্টুকে দেখেই সাহেব বলে ওঠেন, কী সেন্টু, তোমার সাহেব আজকাল বড্ড রাত করে ফিরছে। একটু তাড়া দিয়ে সকাল সকাল ধরে আনতে পার না? সন্ধের পর বাচ্চা নিয়ে একলা থাকি, ভয় করে না?

আজ মেমসাহেব খুবই গম্ভীর। সঙ্গে টিটোও নেই। নিশ্চয় পাশের ফ্ল্যাটে রেখে গেছেন। পাশের ফ্ল্যাটের লালীবৌদিও ভারী ভাল। কিন্তু আজ মেমসাহেবকে অন্যদিনকার চেয়ে ঢের রাগী দেখাচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরেই অবশ্য এই মেঘলা আবহাওয়া চলছে দু'জনের মধ্যে। নিশ্চয় ঝগড়া চলছে, কী নিয়ে ঝগড়া হতে

পারে তা নিয়ে সেন্টু তার মনের ভেতর ঢালা-উপুড় করল কয়েক লহমা। সাহেব যে ক'দিন ধরে অন্য মেয়েলোক নিয়ে একটু টাল খাচেছন. সে সব নিয়েই কি ধুন্ধুমার চলছে দু'জনের! মেমসাহেব সব বুঝতে পেরে গিয়েছেন নাকি? কী করে বুঝলেন? সে সব তো এক সেন্টু ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণীর জানার কথা নয়। না কি মেয়েরা এসব বুঝতে পেরে যায়। মেয়েদের নাকি পুরুষ চেনার একটা আলাদা চোখ থাকে।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর কিছুক্ষণ পিছনের সিটে থমথমে চেহারা। তারপর মেমসাহেবের গলা শোনা গেল, কী ব্যাপার, আজও এক্সপোর্টারদের সঙ্গে মিটিং ছিল নাকি?

জি এম সাহেবের গলা একটু নিচু টোনে, 'না, এম ডি-র সঙ্গে জরুরি আলোচনা ছিল।'

—ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে, অফিসে ফোন করেছিলাম। তুমি ঘরে ছিলে না। অপারেটার বলল, এম-ডি ঘরে আছেন। খুব জরুরি মিটিং চলছে। এম ডি কাউকে লাইন দিতে বারণ করেছেন।

—তুমি কি এতসব খবর পাই-টু পাই নিচ্ছ নাকি টেলিফোন-অপারেটারের কাছ থেকে?

—নিতেই হচ্ছে। কারণ তোমার চালচলন তো ভাল ঠেকছে না আজকাল।

—আস্তে কথা বলো। সেন্টু শুনতে পাবে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। রাসবিহারী অ্যাভেনিউর মোড়ে এসে বাঁয়ে বাঁক নিয়ে সেন্টু ভবানীপুরের পথ ধরল। স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল তার। তার ভাল-মানুষ জি এম সাহেব আস্তে আস্তে নানা গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছেন। একটু পরেই আবার মেমসাহেবের গলা—

—অর্পিতা ফোন করেছিল আজ।

– কে অর্পিতা?

—এর মধ্যে ভুলে গেলে। কলেজে একসঙ্গে পড়তাম। ক'দিন আগেই দেখা হয়েছিল গড়িয়াহাটে, মনে নেই?

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ।

—তোমাকে নাকি সেদিন সন্ধেবেলা হাতিবাগানের মোড়ে দেখেছে।

—আমাকে ?

—হ্যাঁ, আর এক ভদ্রলোকও ছিলেন, সঙ্গে একটি মেয়ে। তুমি ওদের সঙ্গে কথা বলছিলে। কারা ওরা ?

—আমাদের এক অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। বৌ নিয়ে এসেছিল শপিং করতে।

—বৌ ? অর্পিতা বলল সে অবিবাহিতা। সিঁদুর নেই। শাঁখা-পলাও নেই।

—সিঁদুর না থাকলেই অবিবাহিত হয়ে যাবে ? আজকাল কত মেয়ে ওসব ছেড়ে দিয়েছে।

—তা তুমি যে সেদিন বললে তোমার মিটিং ছিল কোথায়।

—মিটিং সেরেই তো ফিরছিলাম। হঠাৎ ওদের দেখে দাঁড়ালাম।

সেন্টুর হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল ব্রেক অ্যাকসিলেটর ক্লাচে পা দাপাতে দাপাতে।

বেশ জবরদস্ত ঝামেলায় পড়েছেন জি এম সাহেব. কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিচ্ছেন মেমসাহেব। এক মিথ্যে বলতে গিয়ে আরও কত মিথ্যেই না বলতে হয় মানুষকে। তার মানে যে মেয়েটাকে সেদিন ট্রেনে করে নিয়ে এসেছেন জি এম সাহেব. তার পরিচয় গোপন করে যাচ্ছেন মেমসাহেবের কাছে। যদুবাবুর বাজারের কাছে এসে সাহেবের নির্দেশমতো ডাইনে বাঁক নিল সেন্টু। পদ্মপুকুরের কাছে একটা দোতলা বাড়ির সামনে নেমে গেলেন দু'জনে।

অভ্যাসমতো সেন্টু জিজ্ঞাসা করল, স্যার, অপেক্ষা করব ?

—না। আমাদের ফিরতে রাত হবে। বন্ধুর গাড়িতেই পৌঁছে দেবেখন।

গাড়ি নিয়ে ফিরতে ফিরতে বাগবাজারের সেই মেয়েটা মনের ভেতর কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেল সেন্টুর। কে মেয়েটা ! ওকে কোত্থেকে এনে জোটালেন সাহেব ? কী সম্পর্ক ওর সঙ্গে ?

মেমসাহেবের জেরায় সাহেবকে পর্যুদস্ত হতে দেখে বেশ মজা

পাচ্ছিল সেন্টু। তাও তো বাগবাজারের মেয়েটার খবর এখনও পাননি মেমসাহেব। তাহলে নিশ্চয় চ্যালাকাঠ হাতে নিয়ে তাড়া করবেন সাহেবকে।

সেদিন হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়িতে তুলে সেই যে মেয়েটাকে বাগবাজারে পেঁছে দিয়ে গেলেন সাহেব, তারপর ঘন ঘন আসছেন তার খবরাখবর নিতে। শুধু খবরই নয়, তাকে নিয়ে যেতে হচ্ছে এখানে ওখানে। সেদিন নিয়ে গিয়েছিলেন হাতিবাগানে। আবার মেমসাহেবের জেরায় নাজেহাল হওয়ার পরদিনই বললেন, সেন্টু, বাগবাজারে যাব। বাগবাজার থেকে তাকে গাড়িতে তুলে বললেন, বিবেকানন্দ রোডের দিকে চল—

আর কী আশ্চর্য, মেয়েটাও আজ যেন জেরা করতে শুরু করল সাহেবকে।

বাগবাজারের মেয়েটা আজ যেন একটু সেজেগুজে বেরিয়েছে। সেদিন কেমন যেন ছন্নছাড়া ভাব ছিল, গম্ভীরও হয়েছিল সারাক্ষণ, বোধহয় মন খারাপ ছিল খুব। আজ শরীরে একটা অন্যরকম জেল্লা। বোধহয় আগের দিন তেমন জামাকাপড় সঙ্গে ছিল না। সেদিন হাতিবাগান থেকে একরাশ শাড়ি জামা কিনে এবার একটু থিতু হয়েছে তার নতুন বাসায়। কিন্তু মেয়েটা হঠাৎ সাহেবের ঘাড়ে চেপে বসলই বা কেন তা বোধগম্য হয়নি আজও। তাই স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে কান খাড়া করে রেখেছে পিছনের সিটের দিকে। মেয়েটার গলাই শোনা গেল।

—কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে? নতুন কোন আস্তানার সন্ধান পেয়েছেন নাকি?

—না। সেদিন ঋতপ্রভর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মনে আছে? ওদের বাড়িতেই।

—কেন? হঠাৎ এক অপরিচিত বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

ঋতপ্রভদের বাড়ির সবাই গান পাগল। প্রায়ই ওদের বাড়িতে গানের আসর বসে। ঋতপ্রভ সেদিন বাড়ি ফিরে ওর মাকে তোমার কথা বলেছে। শুনেই ওর মা বলেছে, তাহলে তোদের জি এম সাহেবকে বল না, মেয়েটাকে নিয়ে একদিন বেড়াতে আসুক।

—সে কী! আমাকে এখন তাদের বাড়ি গিয়ে গান শোনাতে হবে? আমি কিন্তু গান গাইব না।

—কেন, তোমার অসুবিধে আছে? আমিও তো ভাবলাম, কি রকম গাও তুমি, এই সুযোগে আমারও শোনা হয়ে যাবে।

—শুধু আপনাকেই শোনাতে পারি। আর কাউকে নয়।

—আমার সঙ্গে না হয় আরও কেউ কেউ শুনল।

—না। যে কেউ গান শুনতে চাইলেই তাকে গান শোনাতে হবে?

—যে কেউ বলছ কেন? ঋতপ্রভ ভীষণ গান পাগল। ও নিজেও দারুণ গায়। ওর মা এককালে দারুণ গাইতেন। অনেক ফাংশন-টাংশনেও গান গেয়েছিলেন সেসময়।

—তা হোক। আমি গান গাইব না। আপনি গাড়ি ঘোরাতে বলুন।

—প্লিজ সায়ন্তনী। আমি আজ ঋতপ্রভকে কথা দিয়েছি। তোমাকে নিয়ে যাব বলে। ওরা রেডি হয়ে থাকবে। হয়তো দু-একজন আত্মীয়-স্বজনও আসবে আজ। সবাই গান ভালবাসে।

—আসুক, আমাকে না বলে আপনি এরকম প্রোগ্রাম করলেন কেন? গাড়ি ঘোরাতে বলুন। একমাত্র আপনাকেই গান শোনাতে পারি। আর কাউকেও না।

—কেন, শুধু আমাকে কেন?

—সে আপনি বুঝবেন না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রূপম রায় বললেন, প্লিজ সায়ন্তনী, অবুঝ হয়ো না। আমি ওদের কথা দিয়েছি তোমাকে নিয়ে যাব বলে। না গেলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না।

—এ কিন্তু আপনার ভারী অন্যায়। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আজেবাজে লোককে গান শোনাতে হবে?

—আজেবাজে নয়। তুমি গেলেই বুঝতে পারবে কিরকম গানের বাড়ি ওদের। বরং শ্রোতা হিসেবে আমিই আজেবাজে।

—সে অর্থে আজেবাজে বলিনি। আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের একটা ব্যাপার আছে। হঠাৎ এক অপরিচিত বাড়িতে গিয়ে একদল লোকের

মাঝখানে বসে গান শোনাতে হবে ভাবলেই আমার গায়ে জ্বর আসছে।

—মোটেই জ্বর আসবে না। রূপম রায় প্রায় ধমক দিয়ে কথা বললেন, আমি যখন কথা দিয়েছি তখন অন্তত আমার মন রাখার জন্যই তোমাকে গাইতে হবে আজ।

সায়ন্তনী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন। কিন্তু আমার উপর আপনার এমন অধিকার জন্মায়নি এখনও যাতে আপনি হুকুম করতে পারেন।

—অধিকার জন্মায়নি কে বলল?

—জন্মিয়েছে নাকি?

—না জন্মালে আমার ওপর এতটা নির্ভর করলে কেন সেদিন? আমার কাছেই যখন তোমার পরিত্রাণ—

—আপনি কি সত্যিই পরিত্রাতা হচ্ছেন? সেদিন তো বলতে পারলেন না, বিয়ে করতে পারব?

—পরিত্রাণ তো আরও অনেকভাবেই করা যায়। যখন আমার ওপর নির্ভর করেছ, তখন অপেক্ষা করো।

বাকি পথটুকু গম্ভীর হয়েই রইল সায়ন্তনী।

সেদিন বিবেকানন্দ রোডের ওপর মস্ত তিনতলা বাড়িতে গানের আসর সেরে মেয়েটা যখন নেমে এল রূপম রায়ের সঙ্গে, তাকে আরও গম্ভীর, রাগ-রাগ দেখাচ্ছিল। নিশ্চয় গানের আসরের আবহাওয়া পছন্দ হয়নি তার। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ঋতপ্রভ চৌধুরীও নেমে এসেছিলেন বিদায় জানাতে। সেন্টুকে দেখে বললেন, কী খবর, সেন্টু। চা-জলখাবার দিয়ে গিয়েছিল তো?

সেন্টু হাসল, হ্যাঁ, স্যার।

ঋতপ্রভ চৌধুরী এবার গাড়ির পেছনের জানলায় মুখ গলিয়ে দিলেন, স্যার, মিস মজুমদারের যা গলা, তাতে খুব বড় আর্টিস্ট হবেন একদিন। মা তো উচ্ছ্বসিত। আমার বড়মেসোকে দেখলেন তো? ভীষণ সমঝদার। উনিও মুগ্ধ।

সেন্টু গাড়ি ছেড়ে দিতেই সায়ন্তনী এবার রাগে ফেটে পড়ল.

আপনার কী উদ্দেশ্য বলুন তো ? হঠাৎ আমাকে এদের বাড়ি নিয়ে এলেন কেন ?

—বললাম তো, গান শোনাতেই।

—তাহলে ওরা বাড়িসুদ্ধ লোক আমাকে নিয়ে অমন হৈ চৈ করছিল !

জি এম সাহেব হাসলেন, তোমাকে খুব মনে ধরেছে ওদের।

সায়ন্তনী প্রায় ছিটকে উঠল, মনে ধরেছে মানে !

—রেগে যাচ্ছ কেন ? তুমি মেয়েটা এত ভাল, এত সুন্দর গান গাও, ওদের বাড়ি সবাই কিরকম খুশি হয়েছে দেখলে তো।

—ওদের খুশি-অখুশির ধার ধারিনে আমি।

—তবে কার খুশি-অখুশির ধার ধারো ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সায়ন্তনী বলল, আপনার। আপনার ভাল লেগেছে ?

—দারুণ লেগেছে। ভাবতেই পারিনি তোমার গলা এত মিষ্টি।

সায়ন্তনীকে এতক্ষণে খুশি-খুশি দেখাল। একটু পরে আচমকা কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ন করে বলল, আপনি কি আমাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন ?

রূপম রায় অবাক হয়ে বললেন, এ সব আবার কী কথা ! এত গুণবতী মেয়ে তুমি, রূপসীও কম না। তুমি কি কারও বোঝা হয়ে উঠতে পার ?

—তা হলে আমাকে অন্যের বাড়িতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কেন ? যেন মেয়ে দেখাতে নিয়ে গেছেন এমন মনে হচ্ছিল।

রূপম রায় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, যদি তোমাকে দেখে কারও পছন্দ হয়ে থাকে, তোমার তাতে আপত্তি হওয়ারই বা কী আছে ?

উপরের আয়নার মধ্য দিয়ে সেণ্টু এক ঝলক দেখে নিল, সায়ন্তনীর চোখ দুটো অন্ধকারেও জ্বলে উঠল যেন, বলল আপনি কি আমাকে খেলনা পুতুল পেয়েছেন যে, যাকে খুশি দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন ?

রূপম রায় চুপ করে রইলেন। কী বলবেন ভাবতে ভাবতে সেন্টু ততক্ষণে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গিয়েছে বাগবাজারের হোস্টেলের সামনে।

সায়ন্তনীকে পৌঁছে দিয়ে জি এম সাহেব বললেন, চল সেন্টু, অনেক রাত হয়ে গেল আজ।

সত্যিই অনেকটা রাত হয়ে গেছে। চেতলায় পৌঁছে যখন সাহেবকে নামিয়ে দিল সেন্টু, তখন ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজে। নীচে থেকেই দেখতে পেল, তিনতলার জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়ে অপেক্ষা করছেন মেমসাহেব।

—কাল সাড়ে নটায় আসব, স্যার?

—না, না, রূপম রায় ব্যস্ত হয়ে বললেন, কাল ভোরে ক্যানিং বেরুতে হবে। তোমাকে আসতে হবে না। এম ডি ওঁর জন্যে একটা, আমার জন্যে একটা, দুটো ভাড়া গাড়ির জন্য টেলিফোনে বলে দিয়েছেন রেণ্টু-অ্যা-কার এর অফিসে। ফিরতে ফিরতে পরশু। তুমি তার পরদিন সাড়ে ন'টায় আসবে।

১৫

রাত সাড়ে দশটায় বাড়ি ফিরে, পরদিন ভোরেই ক্যানিং যেতে হবে এবং রাতে ফিরবে না, লঞ্চেই রাত্রিবাস, ফিরতে তার পরদিন সন্ধে হবে শুনে অরুণিমা পাথরের মতো চোখ করে তাকাল, এখন কি রোজই প্রমোদভ্রমণ চলবে এভাবে ?

রূপম কিভাবে সামাল দেবে অরুণিমাকে বুঝে উঠতে পারছিল না। ফিরতে এরকম প্রায়ই রাত হয় তার, ট্যুরেও যেতে হয় ঘন ঘন, কখনও দু'দিন তিনদিনও থাকতে হয় বাইরে, তবু এতদিন অরুণিমা এতখানি উত্তেজিত হয়ে পড়েনি, যা ইদানীং হচ্ছে। হাসার চেষ্টা করে বলল, প্রমোদভ্রমণই বটে। সেদিন তোমাকে বলেছিলাম না, আমেরিকা থেকে দুই লালমুখো সাহেব এসেছে। বেশ বড় একটা অর্ডার দিয়েছে সিল্ক-স্কার্ফের। স্কার্ফটা আমেরিকার বাজারে লেগে গেলে মাসে এক লক্ষ সিল্ক-স্কার্ফের অর্ডার পাওয়া যাবে বলেছে! তাহলে কোম্পানি লালে লাল। এম ডি তাই ঠিক করেছেন, দু'জনকে নিয়ে একটু ঘুরতে বেরুবেন সুন্দরবনের দিকে। একটা লঞ্চ ভাড়া করা হয়েছে দু'দিনের জন্য।

—বাহ্, বেশ তোফা ব্যবস্থা। কারুবাকী মিত্র সঙ্গে যাচ্ছে তো! না হলে প্রমোদভ্রমণ কী করে হবে!

রূপম থমকে গেল। অরুণিমার মনে সন্দেহের বীজ এমন গভীরভাবে বাসা বেঁধেছে এখন চট করে তা দূর করা মুশকিল। সন্দেহ এমনই জিনিস যা একবার সেঁধুলে আর ঝেড়ে ফেলা যায় না। যথাসম্ভব শান্ত থেকে বলল, তাহলে বরং তুমিও সঙ্গে চলো। নীচে একটা কেবিন আমার জন্যে বরাদ্দ হয়েছে। তোমার তো লঞ্চে চড়ার শখ ছিল খুব, লঞ্চেও চড়া হবে, সন্দেহেরও নিরসন হবে।

অরুণিমার চোখে তখনও রাগের আগুন জ্বলছে। রূপমের একথা বলার কোনও অর্থই হয় না। কারণ সে ভালই জানে, টিটোর স্কুল এখন পুরোদমে চলছে, অরুণিমার যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।

গৃহবিবাদ সামলে কোনও রকমে 'রেণ্ট-অ্যা-কার'-এর পাঠানো নতুন ঝকঝকে গাড়িতে উঠে দুই সাহেবের হোটেলে এসে নক করল রূপম। সাহেবরা প্রোগ্রামমাফিক প্রস্তুতই ছিলেন, রূপম যেতেই দু'জনে এসে উঠলেন গাড়িতে।

কলকাতা থেকে ক্যানিং মোটামুটি ঘণ্টা দুয়েকের পথ। সাড়ে আটটা নাগাদ ওরা পেঁৗছে দেখল, এম ডি তার আগেই এসে অপেক্ষা করছেন ডেকে। জেটিতে বেশ বড়সড় একটা লঞ্চ তাদের জন্য অপেক্ষমান। লঞ্চটা নতুনই, ওপরের কেবিনটা বেশ প্রশস্ত, ধবধবে সাদা চাদর বিছানো রয়েছে ডাবল-বেডেড কটটিতে। ডেকের ওপর পাঁচ-ছটা বেতের চেয়ার পাতা। বেতের একটা গোল সেণ্টার-টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসতেই মাতলা নদীর ঝোড়ো ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীরের ভেতরটায় কাঁপ ধরে গেল মুহূর্তে। সাহেবরা তো লঞ্চভ্রমণে ভারী খুশি। বলতে লাগলেন, গুড, ভেরি গুড।

এম ডি হিরণ সান্যাল তাকালেন রূপমের দিকে, কোনও অসুবিধে হয়নি তো ?

রূপম ঘাড় নাড়ল, নাহ্। সাহেবরা কাজের ব্যাপারে ভারী পাঙচুয়াল।

—নীচে দু'জন লোককে বলে এসেছি ড্রিঙ্কস্ সার্ভ করার জন্য। সঙ্গে কিছু ফিসফ্রাই, চিকেনফ্রাই করছে। তুমি একটু দ্যাখো তো, হয়ে এল কিনা।

রূপম বুঝতে পারছিল না, এম ডি তাকেই হঠাৎ দুই সাহেবকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার ভার দিলেন কেন। নিজেই তো ওঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে আসতে পারতেন। না কি, তাকে এই দু'দিন ধরে সাহেবদের খাওয়া-দাওয়ার তদারকি করতে হবে! এম ডি ভালই জানেন, এ সব কাজ করতে তার একটুও পছন্দ নয়।

তবু যা হোক, এম ডি-র সামনে বসে থাকা থেকে অব্যাহতি

পাওয়া যাবে এই ভেবে ডেক থেকে উঠে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল রূপম। নীচে দু'পাশে দুটো কেবিন। দুটোতেই সিঙ্গল-বেডেড দুটো কট পাতা। এম ডি কাল বলেছিলেন, রাতের বেলা তার একটায় এম ডি থাকবেন, অন্যটায় রূপম। উপরের কেবিনটায় থাকবেন দুই সাহেব।

ব্যবস্থাপনা চমৎকার সন্দেহ নেই, দুদিন খাওয়া দাওয়াও প্রচুর হবে। ঢালাও ড্রিংকসের ব্যবস্থাও রয়েছে। রূপমের আবার ড্রিংকস চলে না। বরং এক্সপোর্ট ম্যানেজার বার্নিল দত্তগুপ্তকে সঙ্গে আনলে সে বেচারি চুটিয়ে সদ্ব্যবহার করতে পারত বোতলগুলোর।

লঞ্চের ইঞ্জিনের ওপাশে উনুন জেবলে ফ্রাই তৈরি হচ্ছে বেশ হৈ-চৈ করে। সেদিকে এগুতেই হঠাৎ ভূত দেখার মত চমকে উঠল রূপম। কারুবাকী মিত্র দুই রাঁধুনির পাশে দাঁড়িয়ে তদারকি করছে রান্নার। কী ব্যাপার, কারুবাকী মিত্র লঞ্চে এল কী করে!

কারুবাকী ফিরে তাকিয়ে রূপমের বিস্ময়াভিভূত চেহারা দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল, খুব অবাক হয়েছেন, তাই না? কি-রকম সারপ্রাইজ দিলাম বলুন তো?

রূপমের কাছে তখন সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে। কারু-বাকীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন এম ডি নিজেই। সেজন্যই দুই সাহেবকে আনার ভার পড়েছিল রূপমের ওপর। কিন্তু হঠাৎ কারুবাকীকে এখানে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য কী?

রূপমের শরীরের ভিতর তখন উত্তেজনার একটা গরম স্রোত হু-হু করে বয়ে যাচ্ছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জবলে যাচ্ছে রাগে। এম ডি অনেক ভেবেচিন্তে, রীতিমতো প্ল্যান করে আজ কারুবাকীকে লঞ্চে তুলেছেন। রূপমের পক্ষে এই লঞ্চে দু'দিন থাকা মানে সমূহ বিপদ।

কিন্তু ততক্ষণে ক্যানিং ঘাট ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে এসেছে তাদের লঞ্চ এম ভি বনমালী। জেটিতে লঞ্চ বাঁধা থাকতে থাকতেই যদি রূপম বুঝতে পারত, কারুবাকী এই লঞ্চে তাদের দুদিনের সঙ্গিনী, তাহলে হয়তো এম ডি-কে গুডবাই করে নেমে যেত ক্যানিং ঘাটেই।

রূপম ডেক থেকে নীচে নেমে এসেছিল ফ্রাইয়ের খবর নিতে। কিন্তু নেমে দেখল, কারুবাকী প্রথম থেকেই লেগে আছে রাঁধুনির খবরদারি করতে। রূপমের আসার দরকারই ছিল না। তাহলে এম ডি কেনই বা তাকে নীচে আসতে বললেন শুধু শুধু! কারুবাকীর সঙ্গে তার দেখা হওয়ার জন্যই! কারুবাকী কি লঞ্চে এসেও তার কাছে চাকরির জন্য দরবার করবে!

ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে রূপমের শরীরে একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। তার চাকরিটা ঝামেলাপূর্ণ, টেনশন বহুল হলেও যতটা সম্ভব নিস্তরঙ্গ থাকারই চেষ্টা করত সে। একেবারে নিজের ঘাড়ে না আসা পর্যন্ত অফিসের সমস্ত ঝঞ্ঝাট সর্বতোভাবে এড়িয়ে থাকত। কিন্তু যা মানুষ চায় তা তো হয় না, ইচ্ছে না থাকলেও সমস্যা কোত্থেকে আপনা-আপনি তৈরি হতে থাকে, তারপর সময় বুঝে প্রবল ঝাপটে আছড়ে পড়ে গায়ের ওপর।

কারুবাকী ফ্রাইয়ের তদারকিতে ব্যস্ত আছে বুঝতে পেরে নিঃশব্দে উপরে চলে আসতে চাইল রূপম, কিন্তু কারুবাকী তৎক্ষণাৎ ঝঙ্কার দিয়ে বলল, কী হল স্যার, আমি এখানে আছি বলেই কি চলে যাচ্ছেন?

রূপম ঘাড় নাড়ল, নিস্পৃহ কন্ঠে বলল, এম ডি চাইছেন যত শিগগির সম্ভব ফ্রাইয়ের প্লেট উপরে পাঠিয়ে দিতে।

—আর মিনিট দশেক, স্যার। প্রায় হয়ে এসেছে।

—ঠিক আছে, বলে রূপম ফের পা বাড়াল উপরের দিকে। কারুবাকী প্রায় ছিটকে এসে আড়াল করে দাঁড়াল পথ। একটু গলা নামিয়ে বলল, আমাকে এত ভয় পাচ্ছেন কেন? সুন্দরবনে এলে রয়েল বেঙ্গল দু-চারটে থাকবেই তা তো জানতেন। ধরে নিন আর একটা বাঘিনী এই লঞ্চের ভেতরেই রয়েছে। তার সঙ্গে মোকাবিলা করার সাহস অর্জন করুন।

রূপম প্রায় বাকরহিত কারুবাকীর সাহস দেখে। কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছে একেবারে ইয়ার্কির ভঙ্গিতে। তার এত সাহস কোত্থেকে হল তাও পরিষ্কার বুঝতে

পারছে সে। এম ডি-র সঙ্গে তার ওঠা-বসা, গাড়ীতে একসঙ্গে আসা (এবং শোয়াও), সব মিলিয়ে তার এখন রমরমার দিন।

রূপমকে নিরুত্তাপ দেখে কারুবাকী আবার হাসল, কী ভাবছেন স্যার, চাকরিটা দেবেনই না ঠিক করেছিলেন, এখন মনে হচ্ছে, না দিয়ে আর উপায় নেই ?

রূপম দাঁতে দাঁত ঘষটাতে চাইল, কিন্তু দাঁত চোয়াল কিছুই যেন তার বশে নেই. শুধু বলতে পারল, ব্ল্যাকমেল করে যে জিনিস আদায় করতে হয়. সে পাওয়া কখনও সুখের হয় না। বিবেক বলে একটা বস্তু সবার ভেতরেই থাকে।

কারুবাকী একটুও টসকালো না. বলল, দারিদ্রের জন্য যাকে শরীর নষ্ট করতে হয়, তার বিবেক বহুকাল আগেই মারা গেছে, স্যার।

—কিন্তু আমার বিবেক এখনও জীবিত। বলে রূপম আর দাঁড়াল না। কারুবাকীকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত উঠে এল ডেকের উপর। এম ডি তখন দুই সাহেবকে নিয়ে ব্যস্ত। রূপম আসতেই এম ডি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন ফ্রাইয়েরই খোঁজে। রূপম ঘাড় নেড়ে জানাল, আসছে।

বলতে না বলতেই কারুবাকী দু'হাতে দুটো বড় বড় প্লেট নিয়ে হাজির। তাতে মাছ মুরগি ছাপাছাপি। সাহেব দু'জন কারুবাকীকে কিছুক্ষণ হাঁ করে গিলল। তারপর মন দিল তার বহন করে আনা প্লেটে।

রূপমের ভেতর ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে, অনেক ভেবে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না, হঠাৎ কারুবাকীকে আজ এই ট্যুরে কেন নিয়ে এসেছেন এম ডি। কোনও গভীর উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য ছাড়া কোনও কাজ করেন না এম ডি। হয়তো কারুবাকীকে ব্যবহার করে সাহেবদের কাছ থেকে আরও অর্ডার বার করতে চান, অথবা—

অথবা তাকে দিয়ে আরও চাপ সৃষ্টি করবেন যাতে রূপমের হাত দিয়ে চাকরির অর্ডারটা বেরিয়ে আসে।

সেদিন সারাটা দিন এক প্রবল উৎকন্ঠা আর উত্তেজনায় কাটল

রূপমের। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া, পানীয়, প্রমোদের ঢালাও উপকরণ তার সামনে থাকা সত্ত্বেও সে কোনও কিছুতেই সামিল হতে পারল না। সন্ধের পর পানীয় আরও উপছে পড়তে লাগল সবার সামনে। কোম্পানির পয়সায় এহেন উৎকোচ দিয়ে ফরেনারদের পাকড়াও করার একটা রেওয়াজ সর্বত্রই আছে। কিন্তু রূপম কিছুতেই নিজেকে সহজ করে তুলতে পারছে না। তার মাথার ওপর এখন দু-দুটি খাঁড়া আলগাভাবে ঝুলে আছে। কারুবাকীর অবৈধ মাতৃত্ব যেমন সারাক্ষণ বিষপিঁপড়ে হয়ে কামড়ে চলেছে তাকে, তেমনি জাপান-কেলেঙ্কারির সেরা অস্ত্র—রূপমের সই করা সেই স্যাম্পল-কার্ডটি, যা এম ডি সযত্নে গোপন করে রেখেছেন তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে।

সন্ধের পর এম ডি দুই সাহেবকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন উপরের বড় কেবিনটিতে। বাইরে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। কিন্তু কেবিনের ভেতর আলো থাকায় সেখানেই পানীয়ের আসরটি বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠল। এতক্ষণে সাহেবদের সঙ্গ দেওয়া থেকে অব্যাহতি পেতে রূপম গিয়ে বসল ডেকের কোণের দিকে। একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল অন্ধকারের ভেতর চিক চিক করতে থাকা জলরাশির দিকে তাকিয়ে। লঞ্চ সারাদিন চলার পর এসে পড়েছে সুন্দরবনের অনেকখানি গভীরে। দু'পাশে যত-দূরে চোখ যায়, জল শেষ হলেই শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল।

—স্যার, একা বসে আছেন যে বড়, বলতে বলতে পেছনে এসে হঠাৎ দাঁড়াল কারুবাকী, জানেন, সারাদিন এত একা লাগছে না—, বলতে বলতে আর একটা বেতের চেয়ার টেনে এনে বসল ডেকের কিনারে, রূপমের প্রায় গা ঘেঁষেই, আপনারা সব সাহেবদের নিয়ে ব্যস্ত, তাহলে আমিই বা সারাদিন নীচের কেবিনে কী করি! তবু যা হোক, আপনাকে এখন পাওয়া গেল—

রূপমের ভেতর তৎক্ষণাৎ চাগাড় দিয়ে উঠল এক প্রবল বিরক্তি। সে সবে একটু রেহাই পেয়েছে এম ডি-র অসহ্য সাহচর্য থেকে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় জুড়িয়ে নিচ্ছে সারাদিনের জমে ওঠা অপর্যাপ্ত ক্লেদ, হঠাৎ কোত্থেকে এসে জুটল কারুবাকী। তক্ষুণি তার মনে হল, ডেক

থেকে উঠে চলে যায়, কিন্তু এই তো একটা মাঝারি আকারের ডেক, কারুবাকীর আওতা থেকে কোথায় পালাবে। ডেকের নীচে লঞ্চের খোলের মধ্যে গেলে তো আরও বিপদ, সেখানে কারুবাকীর মুখোমুখি হওয়া মানে খোদ রয়েল বেঙ্গল বাঘিনীর গুহায় প্রবেশ করা। কিন্তু ডেকের ওপরে যে কারুবাকী সেও বা কম কিসে! এই মুহূর্তে তার গা ঘেঁসে বসেছে বাঘিনীর মতোই, দুরন্ত হাওয়ায় পত পত করে উড়ছে তার সিল্কের আঁচল, মাঝেমধ্যে অবাধ্য হয়ে সে উড়ন্ত আঁচলের ঝাপটা এসে থিতু হচ্ছে রূপমের চোখেমুখেও, তাতে শিরশির করে উঠছে রূপমের প্রতিটি রোমকূপ. সে বুঝতে পারছে তাকে আরশুলার মতো মোহগ্রস্ত করে ফাঁদে ফেলতে চাইছে কারুবাকী নাম্নী ভয়ংকর টিকটিকিটা, কিন্তু রূপম অন্য ধাতুতে তৈরি, সে দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল কি করবে দিশে খুঁজে না পেয়ে।

—কি, আপনি কি এখনও ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন, জি এম সাহেব?

রূপম অন্ধকারের মধ্যেই তাকাল কারুবাকীর দিকে। মনে হল, বাঘিনীর মতোই তার দু-চোখ জ্বলছে।

কিছু উত্তর না পেয়ে কারুবাকী হঠাৎ অন্ধকারে হেসে উঠল, কী ভাবছেন? কিভাবে আমার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়? সামান্য একটা বে-আইনি কাজ করবেন না পণ করে নিজের মান-সম্মান-প্রতিপত্তি সব বাজি ধরলেন।

রূপম এবারও কোনও কথা বলল না।

—আপনি জীবনে কোনওদিন পাপ করেননি? ছোটখাটো পাপ।

রূপম এতক্ষণে মুখ খুলল. আপনি কী বলতে চান?

—সব মানুষই কিছু না কিছু পাপ সারাক্ষণ করে চলেছে। নিজের ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক। কেউ বড় পাপ করে, কেউ ছোট পাপ। অজস্র ছোট পাপ জমতে জমতে একসময় বড় আকার ধারণ করে। অনেকসময় খুন না করেও ছোট পাপ জমতে জমতে খুনের মতো বড পাপ করে ফেলে কেউ কেউ। আপনিও নিজের ভেতরটা খুঁড়ে দেখুন। অনেক ছোট পাপ এত করেছেন যে তার যোগফল একত্র করে যে পাহাড় হয়েছে তার তুলনায় আমার মতো নগণ্য দুঃস্থ একটি মেয়েকে একটা চাকরি দিলে কোনও অসুবিধেই

হতো না আপনার। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে চলেছে আপনার সামনে, তাতে আপনার আদর্শ কি আর বজায় থাকবে, মিঃ রায় ?

রূপম ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছিল কারুবাকীর কথায়। এহেন কোনও ব্ল্যাকমেলের মুখোমুখি তাকে হতে হবে সে কখনও ভাবেনি। এও ভাবেনি, কারুবাকীকে চাকরি না দেওয়ার অপরাধে এম ডি তার বিরুদ্ধে স্যাম্পল-কার্ডে কারসাজি করার মতো ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবেন।

ডেকের কিনারে বসে হঠাৎই লঞ্চের নীচে নদীর দুরন্ত স্রোতের দিকে চোখ আটকে গেল রূপমের। নদীতে বোধহয় এখন ভাঁটার টান। সুন্দরবনের নদীতে ভাঁটার টান বড় ভয়ংকর। একবার তার চোরাঘূর্ণিতে পড়লে ভেসে উঠতে উঠতে দশ কিলোমিটার পার হয়ে যাবে। ভাবনাটা কয়েক মুহূর্ত মাথায় চক্কর দিতেই রূপমের শরীরে কী এক বীভৎস ভাবনা সহসা ভর করে উঠল। ডেকের খুব কিনার ঘেঁষে বসে আছে কারুবাকী। ডেকের এই জায়গাটায় কোনও রেলিংও নেই। হালকা বেতের চেয়ারে বসা কারুবাকী হঠাৎ যদি কোনওক্রমে নদীর জলে পড়ে যায়, তাহলে আর কোনও দিন হদিশ পাওয়া যাবে না তার। যে মেয়ে ব্ল্যাকমেল করে একজন আদর্শবান পুরুষের সর্বনাশ করতে একটুও কেঁপে ওঠে না, তার কোনও অধিকারই নেই এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার।

রূপম তৎক্ষণাৎ ডেকের উপরটা একবার দেখে নিল। এম ডি দুই সাহেবকে নিয়ে প্রবল উদ্যমে মেতে আছেন কেবিনের ভেতর। পানীয়ের প্রভাবে হাসির ছররা শোনা যাচ্ছে ঘনঘন। গলাও জড়িয়ে আসছে ক্রমশ। ডেকের অপর প্রান্তে একজন খালাসিই হবে বোধহয় টান টান শুয়ে ঘুমোচ্ছে। অন্য পারে খালাসিরা লঞ্চের ভিতরে কেউ রান্নায়, কেউ গল্প করতে বা ঘুমোতে ব্যস্ত। এমন নিশুতির মধ্যে স্রোতের কলকলধ্বনির মধ্যে পা ফসকে যদি কেউ পড়েও যায়, কেউ টেরও পাবে না।

রূপম হঠাৎই কারুবাকীর চেয়ারের পেছনে হাত রাখল এমন ভঙ্গিতে যেন বা আদর করতেই জড়িয়ে ধরতে চায় তাকে।

কারুবাকী অবাক হল, কিন্তু ছিটকে সরে গেল না। পুরুষের এহেন আদরে সে বোধহয় অভ্যস্ত। শুধু মুচকি হেসে বলল, কারও বেঁচে থাকার স্বার্থেও টুকটাক পাপ করা চলে, তাই না!

বলতে বলতে কারুবাকীর গলার স্বর অন্যরকম হয়ে গেল। আশ্লেষে তার এই স্বরভেদ। রূপম বেতের চেয়ারটা সামান্য একটু তুলে ধরল। হালকা চেয়ার, তার ওপর কারুবাকীর পলকা শরীর। চেয়ারটা সামন্য একটু ঝুঁকিয়ে দিলেই কারুবাকী একেবারে সোজা নীচের জলে হারিয়ে যাবে বরাবরের মতো।

রূপম আরও একটু ঝুঁকিয়ে দিল চেয়ারটা, তাতে কারুবাকী বেশ মজাই পেল মনে হয়। সম্ভাব্য কী বিপদ ঘটতে যাচ্ছে সে এখনও অনুধাবন করে উঠতে পারেনি।

রূপম এবার প্রস্তুত হল চেয়ারটা উল্টে দিতে। তার হাত কাঁপছে, বুকের ভেতর ধক ধক শব্দ হচ্ছে, ঝাপসা হয়ে আসছে চোখের সামনেটা। আত্মরক্ষার্থে খুন বলে একটা শব্দ আছে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে, অবশেষে অনিবার্য কার্যকারণে তারই সামিল হতে হচ্ছে রূপমকে।

চোখ বুজে রূপম এবার ঝাঁকুনি দিতে যাবে চেয়ারটায়, হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল কারুবাকী, তবে আপনার ভাগ্য ভাল মিঃ রায়, পাপটা আপনাকে আর করতে হল না —

রূপমের সম্বিত তখনও লুপ্ত হয়ে আছে যেন। কারুবাকীর কথায় তা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল।

—এম ডি নিজেই ফাইল তৈরি করে কাল একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আমাকে ধরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর পি এ হিসাবে। তারপর আজ ভোরেই গাড়িতে তুলে নিয়ে এলেন তাঁর নতুন পি এ-কে ট্রেনিং দেবেন বলে।

রূপম ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারছে না যেন।

কারুবাকীর সহজ আত্মবিশ্বাসী হাসিই তাকে বুঝিয়ে দিল, সে নিয়োগপত্র হাতে পেয়েছে। পরক্ষণে সে আবার বলল, যাক অন্তত আপনাকে আর পাপের দায়ভাগ বহন করতে হল না। বলে হাসল কারুবাকী।

রূপম চট করে চেয়ারের পেছন থেকে তার হাতটা সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার বুকের ভেতর এখনও একশো ঘোড়ার দাপানি জানান দিচ্ছে প্রবল শব্দে। আর একমুহূর্ত দেরি হলেই কী যে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটতে চলেছিল তা সে ছাড়া আর কেউ কোনও দিন জানবে না। একেবারে মোক্ষম সময়ে খবরটা প্রকাশ করেছে কারুবাকী।

কারুবাকী যেন অবাক হয়েছে সে উঠে যাওয়ায়, বলল, কী হল, উঠে গেলেন যে? আমার পাশে বসতে ভাল লাগছে না? না কি আপনার সাবর্ডিনেট হয়েছি বলে—

তখন কত রাত হয়েছে রূপম জানে না। রাতের রান্না তত-ক্ষণে তৈরি করে ফেলেছে কুকরা। সাহেবদের খাওয়ার মতো অবস্থা নেই তখন। তবু ডেকের নীচে ডাইনিং টেবিলে আরও কিছুক্ষণ হাসির ছররা ওড়াল সবাই মিলে।

সাহেবেরা উপরের কেবিনে ঢুকে গেলে রূপমও প্রস্তুত হল তার জন্য নির্দিষ্ট নীচের কেবিনটিতে শোওয়ার জন্য। আর শোওয়ার আগের মুহূর্তে সে দেখতে পেল নীচের অন্য কেবিনটিতে এম ডি হিরণ স্যান্যালের সঙ্গে শুতে চলে গেল নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া পি এ কারুবাকী মিত্র। বোধহয় পি এ হয়ে ওঠার ট্রেনিং নিতেই।

কেবিনের জানালা দিয়ে অবিরাম জলকল্লোল শুনতে শুনতে রূপম আরও শুনল কারুবাকীর খিলখিল হাসির আওয়াজ। এত-ক্ষণ রূপমকে কিরকম টাল খাওয়াচ্ছিল তাই-ই হয়তো রসিয়ে রসিয়ে শোনাচ্ছে এম ডি-কে।

১৬

টিটো হাসছিল, তার মুখে প্রায় বিশ্ববিজয়ের হাসি, সত্যিই আমরা গোয়া যাচ্ছি বাবা। কী মজা, আমার বন্ধুরা শুনলে একেবারে তাক গেগে যাবে,—

টিটো তার মায়ের হাত থেকে রঙিন কার্ডটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। অরুণিমা কালই খবর নিয়ে এসেছে স্কুল থেকে। ওই সময় টিটোদের কোনও টেস্ট-ফেস্ট নেই। তার পর থেকেই একটা খুশির হিল্লোল ছড়িয়ে আছে রূপমদের ফ্ল্যাটে। রূপমও কয়েকদিন পর একটু নিরুদ্বিগ্ন। অন্তত কারুবাকীর যে দৌরাত্ম্য তাকে ক'দিন ভীষণ টেনসনে রেখেছিল, তার থেকে নিস্তার পেয়েছে আপাতত, তবু এম ডি যখন নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কারুবাকীকে চাকরিতে বহাল করতে, এখন কেলেঙ্কারির দায় কতখানি রূপমের কাঁধে চাপাবার চেষ্টা করবেন, সেটাই চিন্তার।

রূপম অবশ্য শেষপর্যন্ত লড়াই দিয়ে যাবে। স্যাম্পেল-কার্ড থেকে আসল স্যাম্পল সরিয়ে যে দু-নম্বরী স্যাম্পল সাঁটা হয়েছে, তাকেই এখন প্রমাণ করতে হবে কোনও উপায়ে।

ট্যুর থেকে ফিরে পরদিন অফিসে তার চেম্বারে গিয়ে বসতেই কারু-বাকী এসে একলহমা 'গুড মর্ণিং স্যার' করে গেল। রূপমের প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে যে চাকরিতে বহাল হয়েছে এবং বহাল তবিয়তেই জাঁকিয়ে বসবে এম ডি'র পি এ হিসেবে, বোধহয় তাইই জানান দিয়ে গেল গুডমর্ণিং-এর মাধ্যমে। হাতের কয়েকটা ফাইল দ্রুত নিষ্পত্তি করতে করতে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল রূপম। এর মধ্যে হঠাৎ ফিনান্স অফিসার চলে এলেন তার চেম্বারে, এ সব কী শুনছি মিঃ রায়। এম ডি-র নতুন পি এ হয়ে যে মেয়েটি কাজে জয়েন করল আজ, সে নাকি আপনার ঘরে সেদিন কেঁদে ভাসিয়েছে?

রূপম চমকে উঠে বলল, কে বলেছে আপনাকে ?

—ইউনিয়নের লিডার বচনবাবু বলে বেড়াচ্ছেন সবাইকে। জি এম নাকি তার কান্না দেখেই গলে গিয়েছিলেন। না কি আরও কোনও ব্যাপার-স্যাপার আছে ভেতরে, কে জানে।

রূপম একবার ভাবল, সত্যি কথাটা ফাঁস করে দেয়। কিন্তু আপাতত চেপে রইল।

হঠাৎ রূপমের ভেতর একটা ভাবনা চকিতে ঘাই দিয়ে উঠল, অ্যাপয়েন্টমেন্টের ফাইলেও এম ডি কোনও কারচুপি করেননি তো! শেষ পর্যন্ত ফাইল খুললে হয়তো দেখা যাবে, রূপমই বেআইনি করে সুপারিশ করেছে কারুবাকী মিত্রের নাম। এখন কোনও ঘটনাই আর অবিশ্বাস্য বলে আর ভাবা যাচ্ছে না।

ফিনান্স অফিসার চলে যাওয়ার পরই তার ঘরে উঁকি দিল অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার ঋতপ্রভ চৌধুরী, স্যার, সায়ন্তনীর গান শুনে কী যে খুশি হয়েছেন মা!

রূপম একটু রহস্য করে বলল, আর তুমি খুশি হওনি ?

ঋতপ্রভর মিষ্টি চেহারাটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুহূর্তে। রূপম তার খুশিয়াল চেহারার ভেতর সেই রহস্য আবিষ্কার করল যা একজন প্রেমিকের অবয়বে ফুটে ওঠে। একমুঠো লাল আবির সহসা খেলা করে গেল তার মুখমণ্ডলে। সে দৃশ্যে কেন কে জানে রূপমের বুকের ভেতরটা চিনচিন করে উঠল। সায়ন্তনীকে বোধ হয় সেই প্রথম দেখাতেই ভাল বেসে ফেলেছে ঋতপ্রভ। তার গান শোনার পর আরও। এতে সায়ন্তনীর শুভাকাঙ্খী হিসেবে উল্লসিত হওরার কথা রূপমের। যে সায়ন্তনীর একটা হিল্লে করতে এ ক'দিন বিভ্রান্তের মতো সে ভেবে চলেছে, তার জন্য সত্যিই একটা আস্তানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এ সংবাদে যতটা খুশি হওয়া উচিত রূপমের তা হতে পারল না। হয়তো রূপমের মনের কোনও এক দুরূহ কোণে সায়ন্তনীর জন্য একটা কুঠুরি তৈরি হয়েছে সায়ন্তনীর ভালবাসার পরিপূরক হিসেবেই। সেইজন্যই রূপমের বুকের ভেতর এই চিনচিনে ব্যথাটুকু জানান দিয়ে গেল সেই ভালবাসার প্রতীক হয়ে।

—স্যার, মা বলছিলেন, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবেন।

রূপম মুহূর্তে বুঝে গেল সব। জিজ্ঞাসা করল, সায়ন্তনীকে নিয়েই নিশ্চয় ?

ঋতপ্রভ মাথা নিচু করে ঘাড় নাড়ল। রূপম তৎক্ষণাৎ বলল, সায়ন্তনীর কিন্তু একটা অতীত আছে। তার মা মারা গেছে। তারপর বড় অবহেলায় মানুষ হয়েছে।

ঋতপ্রভ মন দিয়ে শুনল কথাগুলো, তারপর হেসে বলল, দুঃখী মেয়েরাই কিন্তু ঘরের বৌ হিসেবে সবচেয়ে ভাল হয়, স্যার। দুঃখী মেয়েদের চাহিদা কম থাকে, তারা চট করে মানিয়ে নিতে পারে অন্য পরিবারে এসে।

যেটুকু না বললে নয়, শুধু সেটুকুই বলল রূপম। ঋতপ্রভ বা তার মায়ের জানা উচিত এটুকু। খুবই অবাক হচ্ছিল রূপম, সায়ন্তনীর একটা হিল্লে হয়ে যাবে এত দ্রুত তা ভাবতেই পারেনি। সেদিন কী সৌভাগ্যক্রমে হাতিবাগানের মোড়ে দেখা হয়ে গিয়েছিল ঋতপ্রভর সঙ্গে।

ঋতপ্রভর মায়ের সঙ্গে কথা বলতে যাবে দু-এক দিনের মধ্যেই এমন কথা দিতে ঋতপ্রভ খুশি-খুশি মুখে উঠে দাঁড়াল, বলল, স্যার, গান জানে এমন মেয়েকেই বিয়ে করব এমন ইচ্ছে ছিল বহু-দিনের। সায়ন্তনী সেদিন মুগ্ধ করে দিয়েছে আমাকে।

ঋতপ্রভ চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ এক অদ্ভুত ঔদাসীন্য ঘিরে রইল রূপমকে। এই ক'দিনেই সায়ন্তনীর ওপর তার একটা অধিকার জন্মে গেছে যেন। সেই সায়ন্তনীকে অন্য একজনের হাতে তুলে দিতে হবে ভাবতেই এক তুমুল বিষণ্ণতা গ্রাস করে ফেলল তাকে।

একটু পরেই এম ডি-র ঘর থেকে যে চিরকুটটি বয়ে নিয়ে এল বেয়ারার, তাতে চোখ বুলোতেই ভীষণ চমকে উঠল রূপম। এম ডি নোট দিয়েছেন, গোয়ায় সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিরণ সান্যাল নিজেই যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্য পি এ কারুবাকী মিত্রও সঙ্গে যাবেন।

অতএব জেনারেল ম্যানেজার রূপম রায়কে গোয়া যেতে হচ্ছে না এ যাত্রা। এম ডি-র অনুপস্থিতিতে জি এম-ই কোম্পানির দেখভাল করার দায়িত্বে থাকবেন।

চিরকুটটিতে বারদুয়েক চোখ বুলোতেই রূপমের ভেতর কিছু-ক্ষণ ঝড় বয়ে গেল। কয়েকদিন ধরে অরুণিমা আর টিটো মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে গোয়ায় বেড়াতে যাওয়ার জন্য। এখন হঠাৎ যদি সে বাড়ি গিয়ে বলে, যাওয়া হচ্ছে না, এম ডি নিজেই যাবেন ঠিক করেছেন, তাহলে কী যে একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে তার সংসারে সে ভেবে উঠতে পারছে না। কিন্তু তার চেয়েও বড় হচ্ছে, তাকে একবার যাওয়ার জন্য বলে এখন সে আদেশ রদ করার অর্থ তাকে অপমান করা। কোম্পানির অনেক কর্মচারিই জেনে গেছে সে গোয়া যাচ্ছে, এখন তাকে বারণ করে এম ডি নিজেই যাচ্ছেন শুনলে আড়ালে হাসাহাসি করবে অন্যেরা।

নিজের ভেতর খাণিকক্ষণ আগুন হয়ে রইল সে। একবার মনে হল, পর পর এমন সব অবমাননাকর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে, এরপর কোম্পানি থেকে সরে যাওয়াই বোধহয় তার পক্ষে এই মুহূর্তে মঙ্গল। একবার ভাবল, প্যাডের কাগজে খসখস করে লিখে জানিয়ে দেয়, আই ডু হেয়ারবাই রিজাইন—

পরক্ষণে ভাবল, এই মুহূর্তে নয়, আজ নয়, একটু ভেবেচিন্তে যা করার করতে হবে। অন্য কোনও কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে আর একটা চাকরির ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলেই—

সেদিন রাতটা ভাল করে ঘুমোতেই পারল না। অরুণিমা লক্ষ করল তার অস্থিরতা, বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসাও করল, কী হয়েছে তোমার, অফিসে কোনও গোলমাল, না কি তোমার সেই—

শেষ বাক্যটিতে ছোট্ট একটা কামড় ছিল অরুণিমার। আজ অনায়াসে তা সহ্য করল। যাদের নিয়ে সন্দেহ করছে অরুণিমা, সেই সায়ন্তনী কিংবা কারুবাকী আপাতত কেউই তার কাছে সমস্যা হয়ে নেই। আগে এই ছোট্ট কামড়েই কখনও জ্বলে উঠত, কখনও অসহায় বোধ করত, আজ তার কোনও বোধই হল না।

আরও দু-তিনদিন অফিসের সব ব্যাপারেই ভীষণ নিস্পৃহ, উদাসীন হয়ে রইল। অন্য কোম্পানির কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে টেলি-আলাপ করে জানতে চাইল, কোথাও কোনও ভেকেন্সি হচ্ছে কি না খুব শিগগির।

নেই শুনে আরও গুটিয়ে যেতে লাগল নিজের ভেতর। আরও একটি পলুপোকা হয়ে লালা ঝরাতে ঝরাতে চারপাশে সৃষ্টি করতে লাগল এক কঠিন বর্ম।

দু-তিনদিনের মধ্যে কয়েকটা অর্ডার হাতে পেল বিদেশ থেকে। জার্মানি থেকে একলপ্তে সাতলক্ষ টাকার সিল্ক-থান চেয়েছে রূপম এর পাঠানো স্যাম্পল-কার্ডের উত্তরে। ইটালি থেকেও তিনলক্ষ টাকার। কিন্তু তৃতীয় একটি খাম খুলে লাফিয়ে উঠতে চাইল সে। অর্ডারটি এসেছে সাউথ-ইস্ট এশিয়ার এক ধনী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। মাসচারেক আগে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের লাউঞ্জে তার সঙ্গে মিট করেছিল রূপম। তাদের স্যাম্পেল-কার্ড নিয়ে বলেছিলেন, দেশে ফিরেই অর্ডার পাঠিয়ে দেব। চারমাসের মধ্যে কোনও উত্তর না পেয়ে রূপম ধরেই নিয়েছিল, অন্য কোনও এক্স-পোর্টার বাগিয়ে নিয়েছে অর্ডারটা। হঠাৎ তার কাছ থেকে প্রতি দু-মাসে চারলক্ষ টাকার অর্ডার পেয়ে লাফিয়ে ওঠারই কথা তার। কিন্তু পরমুহূর্তে ফের একবার ইচ্ছে হল, সব অর্ডারগুলোই টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দেয় পেছনের জানালা দিয়ে। কী ভেবে আবার রেখে দিল ড্রয়ারের ভেতর। একেবারে দুরূহ কোণে ঠেলে দিয়ে। থাক, অর্ডারগুলো আপাতত জিরোক।

সেদিন বাড়ি ফিরতে হঠাৎ অরুণিমার হাসি-হাসি মুখ দেখে আশ্চর্য হল রূপম। হয়তো গোয়া যাওয়ার জন্য তোড়জোড় করছে এর মধ্যে। তাইই তার এত উল্লাস। কিন্তু না, অরুণিমা যে খবর শোনাল তাতে তারও ভেতরে জুড়ে এল এক প্রবল স্বস্তি।

—জানো, শৌভিক টেলিফোন করেছিল আজ। তোমার মা স্কুল-কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছিলেন বাবার কোনও টাকা-পয়সা পাওনা আছে কিনা জানতে। কী অসুবিধেয় দিন কাটাচ্ছেন তা

বলেছেন সব। তাতে ওঁরা বলেছেন, মাস দুয়েকের মধ্যে স্কুলের ক্লার্ক রিটায়ার করছেন, তাঁর জায়গায় ওঁরা শৌভিককে নেবেন।

খবরটা তাদের সবার কাছেই স্বস্তির নিঃসন্দেহে। তবু রূপমের ভেতরে কোথাও একটা ছোট্ট ভাঙচুর হয়ে গেল। মা নিশ্চয়ই স্কুল-কর্তৃপক্ষের কাছে বলেছেন, আমার বড় ছেলে একটু খোঁজও নেয় না আমার।

অরুণিমা তখন বলছে, ওহ্‌, গলা থেকে একটা কাঁটা নেমে গেল, বুঝলে। ক'দিন ধরে যা টেনশনে ছিলাম।

খুবই স্বার্থপরের মতো হাসতে হল রূপমকে, যাক বাঁচা গেল।

কয়েকদিন ধরে বহরমপুর যাব-যাব করে শেষ পর্যন্ত গিয়ে উঠতে পারেনি বলে তার বিবেক নামক বস্তুটিতে কিছু একটা যেন কামড়াচ্ছিল সর্বক্ষণ। ভাবল, তার জ্বলুনিটা এবার কমবে, কিন্তু কেন যেন কমল না।

পরদিন অফিস যেতেই হঠাৎ তার টেবিলে ফনোকম বেজে ওঠার শব্দ। বোতাম টিপে রিসিভার কানে লাগাতে শুনল কারুবাকীর গলা, স্যার, এম্‌ ডি-সাহেব বলেছেন, ই, এম-কে নিয়ে ওঁর ঘরে বিকেলের দিকে যেতে। সুইজারল্যাণ্ডের কী একটা ফাইল নাকি আপনার ঘরে আছে, সেই ব্যাপারে ফাইনালাইজড় করতে—

বলেই ওদিকে ফনোকমটা রেখে দিল কারুবাকী। ঠিক এম, ডি-র কায়দায়। রূপম কী বলে না বলে তার শোনার সময় বা ধৈর্য কোনওটাই যেন নেই তার। তার কণ্ঠস্বরটাও কেমন যেন খট্‌ করে কানে বাজল। একটু শক্ত, রুক্ষধরনের। এতদিন এভাবে ফনোকম তুলে এম. ডি কথা বলতেন। এখন তাঁর পি. এ, জয়েন করায় সে কাজটি এম, ডি, সমর্পণ করেছেন কারুবাকীর ওপর।

রিসিভার রেখে বেশ কিছুক্ষণ কপালে ভাঁজ ফেলে বসে রইল সে। তারপর হঠাৎ ফোন করল বাইরের দু-তিনটে অফিসে। সবই প্রাইভেট কোম্পানি। কয়েক বছরে এ-অফিসে সে-অফিসে চাকরির পর রূপমের একটা পরিচিত ছড়িয়েছে অন্যান্য কোম্পানিতে। সেই পরিচিতির সুবাদে এখানে-ওখানে যোগাযোগ করে খোঁজ

নিতে লাগল কোথাও কোনও চাকরি খালি আছে কি না। কয়েক-দিন আগেও একবার ফোনাফোনি করে ব্যর্থ হয়েছিল। আজও তেমন কোনও আশাব্যঞ্জক সাড়া পেল না। তাতে ভীষণ নিরাশ হয়ে পড়ল।

পরের কয়েকদিন রূপম লক্ষ করল, কার্বাকী প্রতিদিনই একবার-দুবার করে ফনোকমে নির্দেশ দিচ্ছে তাকে। সবটাই অবশ্য এম. ডি-র নির্দেশ। তবু কথা বলার সময় কারুবাকীর গলায় এক ধরণের কম্যাণ্ড, যা রূপমকে বিস্মিত করছে প্রতিমুহূর্তে। কাল ই, এম অর্থাৎ এক্সপোর্ট ম্যানেজার বর্নিল দত্তগুপ্তও হঠাৎ বলল, স্যার, এম. ডি-র পি এ-কে তো মনে হচ্ছে হাফ-এম. ডি। কী রকম অর্ডার করছে দেখেছেন!

রূপম মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। এই কারুবাকীই কদিন আগে তার ঘরে এসে কান্নাকাটি করেছিল কত। হঠাৎ এম, ডি-র কাছাকাছি থেকে, ক্রমশ এম, ডি-র হালচাল রপ্ত করে নিয়েছে। এ মেয়ে অনেকদূর উঠবে।

অন্য কোনও কোম্পানিতে অফার না পাওয়ায় রূপম তখন ছট-ফট করছে নিজের ভেতর। এই 'দি ওয়ার্ল্ড-ওয়াইড সিল্ক ট্রেডিং কোম্পানি' তাকে এখন আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছে। তার চারপাশে সোনালি রেশমের এক শ্বাসরুদ্ধ ঘেরাটোপ। এই পলুপোকার আবরণ ছিঁড়েখুঁড়ে বেরুবার আর কোনও উপায়ই নেই এমন মনে হচ্ছে তার। প্রতিদিন সে নিজেই আরও গ্যালন গ্যালন লালা ঝরিয়ে শক্ত করে তুলছে তার চারপাশের কঠিন আস্তরন। যত দিন যাচ্ছে, ততই শঙ্কিত হচ্ছে হয়তো এখানেই তাকে জীবন্ত সিদ্ধ হতে হবে। এই অফিস তার শরীর থেকে নিংড়ে বার করে নেবে জীবনের সোনালি ভাবনাগুলো। তাকে গলিত মৃত করে রেখে দেবে। বেঁচে থেকেও সে হয়ে যাবে এক প্রাগৈতিহাসিক ফসিল। পৃথিবীর আরও অসংখ্য মানুষের মতো এই ইঁদুর-দৌড়ে সামিল হয়ে আরও একটি ফসিল হওয়াই তার একমাত্র ভবিতব্য।